পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ

শিক্ষা ও সভ্যতা

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

ক্যালকাটা পাব্‌লিশার্স
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীবারিদকান্তি বসু

প্রথম সংস্করণ

আশ্বিন, ১৩৩৪

দাম দেড় টাকা

কলিকাতা, ৩১নং সেণ্ট্রাল এভিনিউ
আর্ট প্রেসে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, বি-এ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত

— ৺পিতৃদেবের স্মরণে —

মুখবন্ধ

এ বইএর প্রবন্ধগুলির বেশীর ভাগ 'সবুজ পত্রে', আর বাকী কয়েকটি কয়েকখানা সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'সবুজের হিন্দুয়ানী' প্রবন্ধটি নবপর্য্যায় 'সবুজ পত্রের' প্রথম সংখ্যার জন্য লেখা। উপলক্ষ্যের উপযোগী আকারটি বদ্‌লালে বক্তব্য বহাল থাকলেও রসটা ঠিক থাকে না দেখে ওর সে আকারটি আর বদ্‌লাইনি। প্রবন্ধগুলিকে পুঁথিতে গেঁথে কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা উচিত হ'ল, না পুরণো মাসিক-সাপ্তাহিকের স্তূপের মধ্যে বিস্মৃতির কবর দেওয়াই সমীচীন হ'ত তাতে অবশ্য সন্দেহ আছে। তবে, "বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্"।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

আশ্বিন, ১৩৩৪

সূচীপত্র

শিক্ষার লক্ষ্য
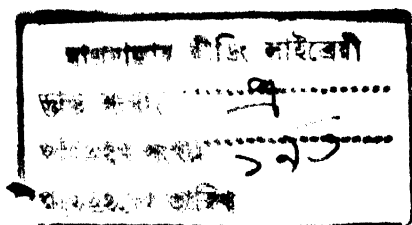
(১)

শিক্ষা সম্বন্ধে এমন কতকগুলি তত্ত্বকথা প্রচলিত আছে, যাদের উদ্দেশ্য—কিছুই না বলিয়া, সমগ্র বিষয়টার একটা সর্ব্বজনসম্মত সুগভীর মীমাংসা করা। এই সকল তত্ত্ববাক্যের মধ্যে একটী এই যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য যথার্থ মানুষ তৈরী করা। মানব-শিশু যখন সচরাচর মানুষের শরীর ও মন লইয়াই ভূমিষ্ঠ হয়,—এবং যেটী না হয়, শিক্ষার দ্বারা তাহাকে যথার্থ মানুষ করার চেষ্টা স্বয়ং বৃহস্পতির পক্ষেও নিষ্ফল,—তখন যথার্থ মানুষ কাহাকে বলে জিজ্ঞাসা করিলে তত্ত্বজ্ঞেরা অবশ্য উত্তরে বলিবেন —আদর্শ-মানবকে, অর্থাৎ অসাধারণ মনুষ্যকে। আদর্শ-মানব

যে কি প্রকার জীব, সে সম্বন্ধে কাহারও সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনও রূপ ধারণা না থাকাতে, জিনিসটা যে অতিশয় কাম্য এবং শিক্ষার দ্বারা অবশ্যলভ্য, এ বিষয়ে কাহারও কোনও দ্বিধা উপস্থিত হয় না; এবং একটা দুরূহ প্রশ্নের সহজ সমাধানে মনও প্রসন্ন হইয়া ওঠে। ইহার পরেও যদি কেহ জানিতে চায় আদর্শ-মনুষ্য কাহাকে বলে, তবে অধিকাংশ বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিশ্চয়ই তাহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিবেন। তবে কোনও কোনও তত্ত্বজ্ঞ হয়তো অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন যে, আদর্শ-মনুষ্য সেই, যাহার শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সকল শক্তি বা বৃত্তিই সম্যক অনুশীলিত হইয়াছে ও পূর্ণরূপে স্ফূর্তিলাভ করিয়াছে; এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য এই শ্রেণীর মানুষ গড়িয়া তোলা। এখন কথা এই যে, প্রথমত এহেন মানুষ চর্ম্মচক্ষে দূরের কথা, কেহ কখনও মানস-নেত্রেও দেখেন নাই। পৃথিবীর কবি ও কল্পনাকুশল লোকেরা যে-সকল মহাপুরুষ ও অতি-মানুষের আদর্শ-চিত্র আঁকিয়াছেন, সে সকলের কোনটিই একাধারে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন অসম্ভব মানুষের চিত্র নয়। সেগুলির কোনটিতে দেখিতে পাই বহু-শক্তির একত্র সমাবেশ, কোনটিতে বা দু-একটি বৃত্তির অতিমাত্রায় বিকাশ; কিন্তু তাহার প্রতিটিই রক্তমাংসের মানুষেরই চিত্র। দ্বিতীয় কথা এই যে, সকল শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি দূরে থাক—দুই চারিটি শক্তির একসঙ্গে একটু অসাধারণ রকম স্ফূর্ত্তির পরিচয় যাহার শরীরে আছে, এমন লোক হাজারে একজন মেলা কঠিন; অথচ শিক্ষা যে সকলের

জন্যই প্রয়োজন, এ সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই। তপস্বী বাল্মীকি যখন নারদকে বীর্য্যবান, ধর্ম্মজ্ঞ, বিদ্বান প্রভৃতি অশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন ত্রিলোকজ্ঞ নারদ সেই ত্রেতাযুগেও ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভব রামচন্দ্র ব্যতীত আর কাহারও নাম করিতে পারেন নাই। এবং কোনও বিশেষ শিক্ষাপ্রণালীর ফলে রামচন্দ্র যে এই সকল গুণের আধার হইয়াছিলেন, এমন কথা নারদও বাল্মীকিকে বলেন নাই, বাল্মীকিও আমাদিগকে বলিয়া যান নাই। তৃতীয় কথা, যদি প্রকৃতই আদর্শ-মানব বা অতিমানুষ গড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য হইত এবং এই উদ্দেশ্য সফল হইবার কোনও সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ শিক্ষার ফলে পৃথিবীটা মানুষের পক্ষে বাসের উপযুক্ত থাকিত কিনা, সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। যে সমাজ-বন্ধনের ভিত্তির উপর মানুষের সভ্যতার ইমারত গঠিত হইয়াছে, তাহার মূল এই যে, মানুষে মানুষে শক্তির প্রভেদ আছে, এবং সে প্রভেদ কোনও শিক্ষার সাহায্যে সম্পূর্ণ লোপ করা যায় না। এই পার্থক্য ও তারতম্য আছে বলিয়াই সমাজে শ্রমবিভাগ ও কার্য্যবিভাগ সম্ভবপর হইয়াছে, এবং এই বিভিন্নতার উপর মানুষের সভ্যতার প্রথম উন্মেষ হইতে অদ্যাবধি সমস্ত পরিণতি নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। যদি শিক্ষার ফলে এই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য লোপ করিয়া সকলকেই সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন আদর্শ-মানুষে পরিণত করা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে সমাজের সমস্ত কাজের কল-কারখানা তখনি বন্ধ হইয়া যাইত।

মানুষে মানুষে প্রভেদ আছে বলিয়াই মানুষের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়। যদি শিক্ষার ফলে সকলেই আদর্শ-মানুষ, অর্থাৎ এক ছাঁচের মানুষ হইয়া উঠিত, তাহা হইলে আমাদের পরস্পরের সঙ্গ আমাদের নিকট এমনই অসহ্য বোধ হইত যে, মানুষ ঘর ছাড়িয়া বনে পালাইতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করিত না। শেষ কথা, পৃথিবীতে মাঝে মাঝে এক একজন অতিমানুষের জন্ম হয়। তাহার ফলে কর্ম্মের জগতে বা চিন্তার রাজ্যে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহা স্মরণ রাখিলে সমাজ যদি কেবল অতি-মানুষেরই সমাজ হইত তাহা হইলে ব্যাপারটা কি ঘটিত মনে করিতেও শরীর শিহরিয়া ওঠে।

অতএব তত্ত্ববেত্তারা যাহাই বলুন না কেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য আদর্শ-মানুষ গড়াও নয়, অতিমানুষ তৈরীও নয়। কেননা এই উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ হইবার সুদূর সম্ভাবনাও নাই, এবং যদি কোনও সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে তাহার ফল অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত।

(২)

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞলোকদের আর একটী মত এই যে, শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত—ছাত্রের চরিত্রগঠন। চরিত্র জিনিসটা কি, তাহা লইয়া তর্ক না-ই তুলিলাম। ধরিয়া লওয়া যাক্ চরিত্র সেই সকল গুণের সমঞ্জসীকৃত সমষ্টি, যাহা মানুষের থাকা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। এই সকল গুণের তালিকা এবং সমষ্টির বিষয়, তাহাদের রূপ ও মাত্রা সম্বন্ধে, বিভিন্ন কালে

শিক্ষার লক্ষ্য

বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা যে ছিল এবং আছে, তাহার প্রমাণ এই যে, শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধেও ভিন্ন দেশকালের প্রচলিত মত কিছু এক নয়। এই বিজ্ঞ বচনের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, মুখে যিনি যাহাই বলুন না কেন, কি প্রাচীন কি আধুনিক কোনও শিক্ষাপ্রণালীই প্রকৃত কাজের বেলায় ছাত্রের চরিত্রগঠনকে তাহার প্রধান লক্ষ্যস্বরূপে গ্রাহ্য করে নাই। যিনি শিক্ষার দ্বারা চরিত্রগঠন বিষয়ে অতিমাত্র উদ্যোগী, তিনিও সাহিত্যের একশ' পাতার মধ্যে দশ পাতা হিতোপদেশ থাকিলে ভাল হয়, এই কথাই বলেন, এবং ইস্কুলের পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে আধ ঘণ্টার জন্যেই নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ইহার কারণ এ নয় যে, মানুষের চরিত্র জিনিসটা সমাজের পক্ষে কিছু কম প্রয়োজনীয়; ইহার কারণ এই যে, চরিত্র জিনিসটা সেরূপ শিক্ষণীয় নয়। মানুষের চরিত্র প্রধানতঃ নির্ভর করে বংশানুক্রম এবং পরিবার ও সমাজের বিশেষ অবস্থার উপর। কেবলমাত্র শিক্ষকের শিক্ষার দ্বারা চরিত্রে যে পরিবর্ত্তন করা যায়, তাহার পরিমাণ অতি সামান্য; এবং তাহাও আবার শিক্ষার গৌণ ফল। সোজাসুজি নীতিশিক্ষার দ্বারা চরিত্র গড়িবার চেষ্টা করিলে, সে শিক্ষা অতি নীরস হইয়া ওঠে—এবং তাহার ফলও প্রায়ই বিপরীত হইতে দেখা যায়। প্রাচীন কালে গ্রীস দেশের পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং প্লেটো তাঁহার যে-সকল মত সক্রেটিসের নামে চালাইয়াছেন, তাহার মধ্যে একটা মত এই যে, চরিত্র বা virtues জ্যামিতি ও অলঙ্কার-

শাস্ত্রের ন্যায়ই একটা শিক্ষণীয় বস্তু। কিন্তু এই মতের মূলে আছে তাঁহার আর একটী মত। (প্লেটোর মতে ভালমন্দের জ্ঞান বুদ্ধির সাহায্যে লাভ করা যায়,—এবং সেই জ্ঞান লাভ করিলেই মানুষ সচ্চরিত্র হয়।) এই জ্ঞানবাদের—intellectualism-এর বিরুদ্ধে ইউরোপের অনেক মনীষী আজ লেখনী ধরিয়াছেন; এবং বেদাধ্যয়নেও যে দুরাত্মার চরিত্রের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, তাহা আমাদের দেশের উদ্ভট কবিতার অজ্ঞাত-নামা কবি অনেক পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন।

এ বিষয়ে একটা ভুল ধারণা থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর সহিত বিলাতের শিক্ষাপ্রণালীর তুলনা করিয়া আমাদের কর্ত্তৃপক্ষেরা এবং তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন, এবং আমরাও শুনিয়া শুনিয়া বলি যে, বিলাতে ইস্কুল-কলেজে ছাত্রদের চরিত্র গঠিত হয়, আর আমাদের ইস্কুল-কলেজ হইতে ছাত্রেরা কেবল কতকগুলি কথা মুখস্থ করিয়া চলিয়া আসে। কথাটা সত্য বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যাক্। কিন্তু ইহাতে এ প্রমাণ হয় না যে, বিলাতের ইস্কুল ও ইউনিভার্সিটীতে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার ফলেই ছাত্রদের চরিত্র গঠিত হয়। বরং আমাদের কর্ত্তৃপক্ষেরা উল্টো কথাই বলেন। তাঁহারা বলেন যে, সেখানকার ইস্কুল-ইউনিভার্সিটির life বা আব্‌হাওয়াতেই শিক্ষার্থীদের চরিত্র গড়িয়া ওঠে অর্থাৎ সেখানকার ছাত্রদের চরিত্র সেখানকার বিদ্যালয়গুলির সামাজিক জীবনের ফল,

শিক্ষার ফল নয়। সুতরাং সামাজিক অবস্থার গুণে যেটা আপ্‌না হইতেই জন্মলাভ করে, সেটাকে শিক্ষার ঘাড়ে চাপাইয়া আমাদের ছাত্রগণের কোনও হিতৈষী যেন তাহাদের পাঠ্য-পুস্তকের মধ্যে শেলীর পরিবর্ত্তে Smiles-এর আমদানী না করেন।

(৩)

এখন শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি আদর্শ-মানুষ গড়াও না হয়, শিক্ষার্থীর চরিত্রগঠন করাও না হয়—তবে তাহার উদ্দেশ্যটা কি? এ প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া খুব কঠিন নয়, এবং সে উত্তরও সকলেরই জানা আছে; কিন্তু সেটা প্রকাশ করিয়া বলিতে আমরা সকলেই অল্প-বিস্তর লজ্জিত হই। কেননা উত্তরটা অতি সাধারণ রকমের, এবং বড় কথা বলিয়া ও শুনিয়া আমরা যে আত্মপ্রসাদ লাভ করি—সোজা কথা বলায় ও শোনায় আমরা সে সুখে বঞ্চিত হই। কথাটা এই যে—শিক্ষার উদ্দেশ্য বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া; অর্থাৎ যার প্রথম সোপানকে সমস্ত বিষয়টার নামস্বরূপে ব্যবহার করিয়া আমরা বাঙ্গলা কথায় বলি—লেখাপড়া শিখান। কি পুরাতন, কি বর্ত্তমান সমস্ত শিক্ষা-প্রণালীর লক্ষ্যই যে এই বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া, তাহা টোল, পাঠশালা, ইস্কুল, কলেজগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই প্রত্যক্ষ করা যায়। নিতান্ত সূক্ষ্মদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া এই স্থূল বিষয়টা আর কাহারও চোখ এড়াইবার সম্ভাবনা নাই। শিক্ষার

উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে-সকল তত্ত্বকথা আছে, তাহাদের উদ্দেশ্যই এই নিতান্ত সোজা কথাটাকে চাপা দেওয়া, যাহাতে তাহা নিজগুণে প্রকাশ না হইয়া পড়ে।

তত্ত্বজ্ঞানীদের সমস্ত বচন উপেক্ষা করিয়া এবং বিজ্ঞব্যক্তি-দের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, পৃথিবীর শিক্ষালয়গুলি যখন বরাবর বিদ্যাশিক্ষা দেওয়াকেই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য করিয়াছে, তখন ইহার মূলে যে নিছক বোকামী ছাড়া আরও কিছু আছে, তাহাতে অতি-বুদ্ধিমান ভিন্ন আর কেহ সন্দেহ করিবেন না। আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, বিদ্যাশিক্ষাই যে কার্য্যতঃ শিক্ষার লক্ষ্য হইয়া আছে, কেবল তাহাই নহে,—প্রকৃতপক্ষে উহাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। একটু ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যাইবে যে, বিদ্যাশিক্ষা জিনিসটা মানবসমাজের যুগযুগান্তরসঞ্চিত সভ্যতার সহিত পৃথিবীতে নবাগত মানব সন্তানের পরিচয় করান। এই পরিচয় শিক্ষার দ্বারাই সম্ভব, এবং শিক্ষা ভিন্ন আর কোনও রকমেই হইবার উপায় নাই। আদিম কাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত বহু-আয়াসলব্ধ সভ্যতার ফল নানা বিদ্যারূপে সঞ্চিত আছে ও হইতেছে। শিক্ষা এই বিদ্যাগুলির সঙ্গে মানুষের পরিচয় সাধন করে। অতি সভ্যসমাজের শিশুও অসভ্য হইয়া জন্মায়, এবং শিক্ষার মধ্য দিয়া এই বিদ্যাগুলির সহিত পরিচয় লাভ না করিলে অসভ্য অবস্থাতেই বাড়িয়া উঠিত। অসভ্য অর্থ বুদ্ধিহীনও নয়, হৃদয়হীনও নয়,—অসভ্য অর্থ বিদ্যাহীন। অসভ্যের সমাজ সেই

শিক্ষার লক্ষ্য

সমাজ, যাহার প্রতিপুরুষের লোকের জন্য পূর্ব্বপুরুষের ও পূর্ব্বকালের এমন কোনই সঞ্চিত বিদ্যা নাই, যাহা বিশেষ শিক্ষা ভিন্ন আয়ত্ত হয় না। সভ্য-সমাজের লোক ইস্কুল-কলেজে শিক্ষা না পাইলেও বংশানুক্রমের ফলে এবং সামাজিক অবস্থার প্রভাবে মোটামুটী সভ্য সমাজোচিত বুদ্ধি ও চরিত্র লাভ করে; কিন্তু রীতিমত শিক্ষা না পাইলে অতি বড় পণ্ডিতবংশের প্রতিভাবান্ সন্তানও মূর্খই থাকিয়া যায়। কেননা বিদ্যার বংশানুক্রম নাই। সকল রকম বিদ্যাই প্রতি যুগের লোককে নূতন করিয়া আয়ত্ত করিতে হয়। এবং এই ক্রমাগত নূতন চেষ্টার ফলেই মনুষ্যসমাজের লব্ধ বিদ্যা প্রালব্ধ না হইয়াও রক্ষিত হয়। যদি পৃথিবীর একপুরুষের সমস্ত লোক একবার সমস্ত বিদ্যাশিক্ষা হইতে বিরত থাকে, তবে মানুষের আদিকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত সঞ্চিত সমস্ত বিদ্যা ও সভ্যতা একপুরুষেই লোপ পায়, এবং মানুষকে আবার প্রাচীন বর্ব্বরতায় কাঁচিয়া বসিয়া সভ্যতার পুনর্গঠন আরম্ভ করিতে হয়। সুতরাং বিদ্যাশিক্ষা ব্যাপারটা একেবারে অকিঞ্চিৎকর জিনিস নয়। ইহার অর্থ—মানুষের বহুযুগের চেষ্টার ফলে অর্জ্জিত সভ্যতার সহিত পরিচিত হইয়া, অসভ্য অন্তত ন-সভ্য অবস্থা হইতে সভ্য হওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে এই কষ্টলব্ধ প্রাচীন সভ্যতাকে রক্ষা করা।

কথাটা আরও পরিষ্কার করিতে হইলে একবারে অনেকটা গোড়ার কথা ধরা ছাড়া উপায় নাই।

(৪)

মানুষের সভ্যতা অতি প্রাচীন। সচরাচর কথাবার্ত্তায় আমরা এই প্রাচীনতা সম্বন্ধে যে ধারণা প্রকাশ করি, ইহা তদপেক্ষা অনেক বেশী প্রাচীন। প্রাচীন সভ্যতার কথা উঠিলেই আমরা বৈদিক, ব্যবিলন, বা মিশরের সভ্যতার কথা তুলিয়া এমন ভাবে কথা কই, যেন ঐগুলি মানব-সভ্যতার আদিম অবস্থা। প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল সভ্যতা অতি সুপরিণত এবং মানুষের সভ্যতার প্রথম অবস্থা হইতে বহুদূরে অবস্থিত। অনেক বিষয়ে ঐ সকল সভ্যতা যেস্থানে আসিয়া পৌছিয়াছিল তাহার পর হইতে একাল পর্য্যন্ত মানুষের সভ্যতা সেদিকে আর বড় বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। এই কথা মনে না থাকায় আমরা যাহাকে আধুনিকতা বলি, প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে পদে পদে তাহার পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্য হই, এবং এই সকল সভ্যতা হইতেও বহু প্রাচীন অথচ পরিপুষ্ট সভ্যতার বিবরণ আবিষ্কার হইলে আমরা অতিমাত্রায় বিস্ময় প্রকাশ করি।

মানুষের এই সুপ্রাচীন সুপরিণত সভ্যতা মানুষ যে সম্পূর্ণ অসভ্যতার হাত হইতে ক্রমশঃ উদ্ধার করিয়াছে তাহাতে সংশয় নাই, এবং বর্ত্তমানের অতি সুসভ্য মানুষ যে অতীতের নিতান্ত অসভ্য আদিম মানুষেরই বংশধর তাহাতেও সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখি না। মানুষ যে অসভ্যতা হইতে ক্রমশঃ সুসভ্যতায় উপনীত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত জনসাধারণের মনে বড় একটা সংশয় নাই।

তাঁহারা জানিয়া রাখিয়াছেন যে, ইহা ইভলিউশনের ফল। ইহার অর্থ কেবলমাত্র এই নয় যে, মানুষের সভ্যতা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করিয়াছে; কেননা এই ক্রমবিকাশের কথা ত অল্প-বিস্তর ঘটনারই বিবৃতি, তাহার ব্যাখ্যা নয়। এই ইভলিউশনবাদের সম্পূর্ণ অর্থটা এই যে, যে নিয়মে অতি নিম্ন-শ্রেণীর জীবদেহ হইতে পৃথিবীতে অতি উচ্চশ্রেণীর জীব-শরীর ক্রমশঃ উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া প্রাণতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, ঠিক সেই নিয়মেই মানুষের সভ্যতা অতি নীচ অবস্থা হইতে ক্রমশঃ উচ্চ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। প্রসিদ্ধ ইংরাজ দার্শনিক হার্ব্বার্ট স্পেন্সার এই মতটা খুব জোরের সহিত প্রচার করিয়াছেন এবং সেই প্রচারের কাজটা এতই সাফল্য লাভ করিয়াছে যে, যাঁহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্পেন্সারের লেখার সহিত কোনও পরিচয় নাই, তাঁহাদেরও এই মতের সত্যতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। এবং বোধ হয় এই মতটা পোষণ করা আধুনিকতা ও বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধির লক্ষণ বলিয়াই শিক্ষিত-সমাজে গণ্য ও মান্য। কিন্তু মতটা আগাগোড়া মিথ্যা। পৃথিবীতে জীবশরীরের ক্রমবিকাশের নিয়মের সহিত মানুষের সভ্যতার ক্রমোন্নতির কোনও সম্পর্ক নাই। এই দুই ব্যাপারের নিয়ম ও প্রণালী সম্পূর্ণ পৃথক, এবং পৃথক বলিয়াই অসভ্য শিশুকে শিক্ষা দিয়া সুসভ্য মানুষ করা সম্ভব হয়, এবং পৃথক বলিয়াই সভ্য মানুষের সমাজে শিক্ষা এতটা স্থান জুড়িয়া আছে। যদি সত্যই

Organic Evolution-এর নিয়মে মানবসভ্যতার বিকাশ হইত তাহা হইলে মানুষের জীবনে শিক্ষার কোনও স্থান থাকিত না; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতালব্ধ সমস্ত বিদ্যা শিশুর মনে আপনিই স্ফুরিত হইত এবং যে হতভাগ্যের হইত না স্বয়ং ফ্রোবেলও সারাজীবন শিক্ষা দিয়া তাহাকে বর্ণ পরিচয় করাইতে পারিতেন না।

Organic Evolution-এর মূলে আছে Heredity। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহীন, উদরসর্ব্বস্ব জীবাণু হইতে যে পৃথিবীতে ক্রমে মানুষের জন্ম হইয়াছে ইহার গোড়ার কথা এই যে, জনক জননীর দেহের ও মনের ধর্ম্ম সন্তানে সংক্রমিত হয়। ফলে যখন জনক জননীর শরীরে বা মনে নূতন কিছুর আবির্ভাব হয় তখন তাহাদের সন্তান, অন্বয়ানুসারে সেই নূতনত্ব লাভ করে। যদি জীবন-সংগ্রামে এই নূতন কিছুর দ্বারা কোনও সুবিধা হয় তবে যাহাদের সেটা আছে তাহার সাহায্যে সেই শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে তাহারাই বাঁচিয়া থাকে এবং বংশ রাখিয়া যায়, বাকীগুলি নির্ব্বংশ হইয়া মরে। এবং এইরূপে যুগের পর যুগ নানা বিভিন্ন অবস্থায় নূতনত্বের উপর নূতনত্ব পুঞ্জীভূত হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়হীন এক Cell-এর জীব হইতে পশুপক্ষী ও মানুষের উদ্ভব হইয়াছে। এই হইল Organic Evolution সম্বন্ধে পণ্ডিতদের আধুনিক মত।

কেমন করিয়া জীব-শরীরে এই নূতনত্বের আবির্ভাব হয় এবং কোন্ জাতীয় নূতনত্ব Organic Evolution-এর

প্রধান ভিত্তি, এ সম্বন্ধে ত্রিশ বছর পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা যতটা একমত ও নিঃসংশয় ছিলেন এখন আর তেমন নহেন। তখনও ডারুউইনের প্রচারিত ব্যাখ্যাই সকলে মান্য করিতেন। ঐ ব্যাখ্যা অনুসারে জনক জননীর সহিত সন্তানের যে সব ছোটখাটো জন্মগত বিভিন্নতা প্রতিদিনই দেখা যায়, যাহার ফলে ছেলেটা বাপের মত হইয়াও ঠিক তাহার মত হয় না, সেই নিত্যসিদ্ধ নূতনত্বই ইভলিউশনের প্রধান সহায়। আর এক সহায়, প্রত্যেক প্রাণীর জীবনকালের মধ্যে বাহিরের চাপে ও ভিতরের চেষ্টায় তাহার মধ্যে যে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। কিন্তু ডারুউইনের এই মতের আসন এখন টলিয়াছে। এখন পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, যে নূতনত্বের উপর ভর করিয়া unicellular জীব মানুষে আসিয়া পৌছিয়াছে তাহা প্রতি-দিনকার আটপৌরে নূতনত্ব নয়। প্রাণীর শরীরে মাঝে মাঝে অতি দুর্জ্ঞেয় কারণে হঠাৎ এক একটা বড় রকমের পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। যদি তাহাতে জীবনযুদ্ধের কোনও সহায়তা হয় তবে ত কথাই নাই, অন্তত পক্ষে যদি নিতান্ত বিপত্তিকর না হয় তাহা হইলেই ঐ পরিবর্ত্তনটী স্থায়ী হইয়া বংশানুক্রমে চলিতে থাকে। বর্ত্তমানে অধিকাংশ প্রাণীতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরই মত যে এই সকল হঠাৎ-উপস্থিত বড় রকমের নূতনত্বই Organic Evolution-এর প্রধান কারণ। প্রতি প্রাণীর জীবদ্দশায় বাহিরের প্রকৃতির চাপে ও ভিতরের শক্তির প্রয়োগে তাহার মধ্যে যে পরিবর্ত্তন হয় সে সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা

এখন বলিতেছেন যে, ঐ জাতীয় পরিবর্ত্তন সন্তান-সন্ততিতে মোটেই সংক্রমিত হয় না। প্রাণীর শরীরে দুই রকমের মাল-মশলা আছে। এক শ্রেণীর মালমশলায় তাহার শরীর গঠিত হয়, দ্বিতীয় রকমের মালমশলা বংশরক্ষার জন্য সঞ্চিত থাকে। বাহিরের চাপে বা ভিতরের চেষ্টায় যে পরিবর্ত্তন তাহা ঐ প্রথম শ্রেণীর মালমশলাতেই আবদ্ধ থাকে, দ্বিতীয় শ্রেণীর মালমশলা সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকিয়া যায়। ফলে ঐ স্বোপার্জ্জিত পরিবর্ত্তন সন্তান-সন্ততির নিকট পৌঁছে না। যখন দ্বিতীয় শ্রেণীর মাল-মশলায় পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, সেই পরিবর্ত্তনই বংশানুক্রমে চলে। এই পরিবর্ত্তনের কারণ এখন পর্য্যন্তও একেবারেই অজ্ঞাত। এবং জীবশরীরে যে সকল হঠাৎ বড় বড় পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়া Organic Evolution-কে ধাপে ধাপে টানিয়া তুলিয়াছে তাহার কারণ এই দ্বিতীয় রকমের মালমশলায় পরিবর্ত্তন।

এই ত গেল সংক্ষেপে Organic Evolution-এর নিয়ম-সম্বন্ধে পণ্ডিতদের বর্ত্তমান মত। এখন ইহার সহিত মানুষের সভ্যতার ক্রমোন্নতির সম্পর্কটা কি? মানুষের কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত কিছুই ত মানুষের শরীরে দাগ কাটে না, বিশেষত শরীরের সেই মালমশলাগুলিতে যাহার উপর বংশানুক্রম নির্ভর করে। এগুলি বাহিরের বস্তু। মানুষ এগুলিকে আবিষ্কার করিয়াছে, সৃষ্টি করিয়াছে। ইহারা এক পুরুষের শরীর হইতে আর এক পুরুষের শরীরে সঞ্চারিত হয় না। এক পুরুষের মানুষ পরের পুরুষের মানুষকে এগুলি সঞ্চিত

ধনের মত দান করিয়া যায়। ইহারা মানুষের heredity নয়, inheritance। এগুলির বংশানুক্রম নাই, আছে উত্তরাধিকার। এবং এ ধনের উত্তরাধিকারী একমাত্র অঙ্গজ নয়, সমগ্র মানব সমাজ।

তারপর ডারুউইনের Survival of the fittest নিয়মেরও এখানে কোনও প্রভাব নাই। সভ্যতার যাহা শ্রেষ্ঠ ফল তাহার দ্বারা জীবনসংগ্রামে কোনও কাজই হয় না। Bionomial theorem আবিষ্কার করিয়া Newton-এর জীবনযাত্রার এবং বংশরক্ষার যে কোন সুবিধা হইয়াছিল, ইহা তাঁহার জীবনচরিত লেখকেরা বলেন না, এবং যাঁহারা ঐ তত্ত্বটী আবিষ্কার করিতে পারেন নাই তাঁহারা যে নির্ব্বংশ হন নাই ইহাও নিশ্চিত। কাব্য রচনার ফলে জীবনযুদ্ধে জয়লাভের কতটা সুবিধা হয় সে সম্বন্ধে দেশী বিদেশী ভুক্তভোগী কবিদের আত্মোক্তির অভাব নাই, এবং অকবি লোকও যে সংসারে টিঁকিয়া থাকে এবং বংশরক্ষা করিয়া তবে মরে তাহাও অস্বীকার করা চলে না।

এ কথা সত্য যে, মন ও ইন্দ্রিয়ের যে-সব শক্তির প্রয়োগে মানুষ সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে, ঐ শক্তিগুলি Organic Evolution-এরই ফল। মানুষের বুদ্ধি, প্রতিভা, কল্পনা, ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মানুভূতি এগুলি যে জন্মগত ইহা ত প্রতিদিন চোখেই দেখা যায়। এবং ঐ শক্তিগুলিই যে জীবনযুদ্ধে মানুষের সহায় হইয়া তাহাকে পৃথিবীর রাজাসনে বসাইয়াছে তাহাও স্থিরনিশ্চিত। কিন্তু ঐ শক্তিগুলিকে যে-সব কাজে লাগাইয়া

মানুষ সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা Organic Evolution-এর চোখে একবারে বাজে খরচ, সম্পূর্ণ অপব্যবহার। Organic Evolution-এর ফলে মানুষ লাভ করিল তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি, যেন শিকারের ও শিকারীর মৃদু পদশব্দটিও কাণে না এড়ায়, মানুষ সেই সুযোগে গড়িল সঙ্গীত-বিদ্যা। ইভলিউশনে মানুষ পাইল দশ আঙ্গুলের সূক্ষ্ম স্পর্শানুভূতি, যেন তাহার তীরের লক্ষ্যটা একেবারে অব্যর্থ হয়; সে বসিয়া গেল তাঁত পাতিয়া মলমল বুনিতে, আর তুলি ধরিয়া ছবি আঁকিতে। ইভলিউশন মানুষকে দিল তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর কল্পনা যেন সে নানা ফিকিরে শরীরটাকে ভাল রকম বাঁচাইয়া বংশটা রাখিয়া যাইতে পারে, মানুষ গড়িয়া তুলিল কাব্য, বিজ্ঞান, দর্শন। ইভলিউশনে মানুষের কণ্ঠে আসিল ভাষা—যাহাতে তাহার পক্ষে দলবদ্ধ হওয়া সহজ হয়, মানুষ সৃষ্টি করিয়া বসিল—ব্যাকরণ আর অলঙ্কার। মোট কথা মানুষ সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে প্রাণের ঘরের চোরাই মাল মনের কাজে খরচ করিয়া। প্রাণের ঘরকন্নার জিনিস মনের বিলাসে ব্যয় করার নাম সভ্যতা।

মানুষের এই তহবিল তছরুপের একটা ফল এই যে, মানুষের ইন্দ্রিয়ের ও মনের শক্তি Organic Evolution-এ যেখানে আসিয়া পৌছিয়াছিল সেই খানেই থামিয়া আছে। ঐতিহাসিক কালের মধ্যে যে এই সকল শক্তির কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা বোধ হয় না। প্রাচীন গ্রীক অপেক্ষা যে নবীন ফরাসীর বুদ্ধি ও রূপজ্ঞান অধিক তাহার কোন প্রমাণ নাই, এবং বৈদিক যুগের হিন্দুর

অপেক্ষা আমাদের মানসিক শক্তি যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এমন কথা কি সবুজপন্থী কি সনাতনপন্থী কেহই বলিবেন না। তবে প্রাচীন কালের তুলনায় বর্ত্তমান সভ্যতার অনেক বিষয়ে আশ্চর্য্যজনক বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রাচীন পণ্ডিতের যাহা স্বপ্নেরও অতীত ছিল বর্ত্তমানের শিশুরাও তাহা হাতে খড়ির পরেই শেখে। তাহার কারণ সভ্যতা বাড়ে টাকার সুদের মত। এক যুগের মানুষ যাহা সৃষ্টি করে, পরের যুগের মানুষ শিক্ষার সাহায্যে তাহাকে আয়ত্ত করিয়া আবার তাহার উপর নূতন সৃষ্টির আমদানি করে,—এই রকমে প্রাচীন সৃষ্টির উপর নবীন সৃষ্টি জমা হইয়া মানুষের সভ্যতা বাড়িয়া চলে। প্রাচীন যুগে যাঁহারা সভ্যতার গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মানসিক শক্তি যে আমাদের চেয়ে কিছু কম ছিল তাহা নয়, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টার ফল যে অনেক বিষয়ে আমাদের কাছে খুব সামান্য বোধ হয় তাহার কারণ আমরা পাইয়াছি তাহার পরের শত যুগের চেষ্টার পুঞ্জীভূত ফল। এবং আমরা যে নূতন সৃষ্টি করি তাহা এই বহুযুগের সৃষ্টিকে ভিত্তি করিয়া। এই জমান সভ্যতার পুঁজি যে মাঝে মাঝে অল্প-বিস্তর খোয়া যায় না তাহা নয়; তখন আবার মানুষকে কাঁচিয়া আরম্ভ করিতে হয়। এবং বুনিয়াদী ঘরের জমান টাকার মতই ইচ্ছা করিলে কিছুমাত্র না বাড়াইয়া দুই এক পুরুষেই ইহাকে ফুঁকিয়া নিঃশেষ করিয়াও দেওয়া যায়। ইহার দৃষ্টান্তের জন্য আমাদের বেশী দূরে যাইতে হইবে না।

শিক্ষা ও সভ্যতা

(৫)

Organic Evolution-এর রাজ্যে বিদ্রোহী হইয়া তাহার রাজ্য লুটিয়া আনিয়া, মানুষ যে সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ফল সঞ্চিত হইয়াছে সাহিত্যে, কলায় এবং বিবিধ বিদ্যায়। শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য এইগুলির সহিত মানুষের পরিচয় করাইয়া দেওয়া। এই সকল বিদ্যা ও কলা অতীতের নিকট হইতে বর্ত্তমানের উত্তরাধিকার। শিক্ষার লক্ষ্য এই উত্তরাধিকারে মানুষকে অধিকারী করা। কেননা এ ত কোম্পানীর কাগজের দান নয় যে ঘরে বসিয়া সুদ পাওয়া যাইবে। এ হইল কষ্টে গড়া ব্যবসায়ের উত্তরাধিকার। কাজ শিখিয়া চালাইতে পারিলে তবেই লাভের সম্ভাবনা।

সভ্যতার এই ফলগুলি শিক্ষার দ্বারা মানুষকে আয়ত্ত করান যায়, কেননা যে শক্তির প্রয়োগে ইহাদের সৃষ্টি সে শক্তি অল্প-বিস্তর মানুষ জন্ম হইতেই লাভ করে। সেই জন্য অসভ্য সমাজের শিশুও শিক্ষা পাইলে সভ্যসমাজের ছেলের মতই সভ্যতার বিদ্যাগুলিকে আয়ত্ত করিতে পারে। ইহার পরীক্ষা অনেকবার হইয়া গিয়াছে। অন্যদিকে সভ্যসমাজের ছেলেকেও শিক্ষা পাইয়াই এই বিদ্যাগুলির সহিত পরিচিত হইতে হয়। কেননা বিদ্যা ত মানসিক শক্তি নয়, উহা মানসিক শক্তির সৃষ্টি এবং সহস্র যুগের মানব-প্রতিভার সমবেত সৃষ্টি। প্রকৃতি যাহার কপালে প্রতিভার তিলক পরাইয়াছেন, যে কেবল সভ্যতার সৃষ্টিগুলিকে নিজস্ব করিতে পারে তাহা নয়, তাহার

উপর নিজের সৃষ্টিও যোগ করিতে পারে, তাহাকেও এই শিক্ষার দ্বার দিয়াই সভ্যতার রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। কেননা এমন প্রতিভার কল্পনা করা যায় না, যাহা সভ্যতার কোনও সৃষ্টিকে আবার প্রথম হইতে একাই গড়িয়া তুলিতে পারে। প্রাচীন সৃষ্টির উপর দাঁড়াইয়াই তবে নূতন সৃষ্টি করা সম্ভব।

শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগে আর একটা মত প্রচলিত হইয়াছে যাহা বিজ্ঞলোকের পাণ্ডিত্যের ফল নয়। সংসারের চাকা বর্ত্তমান যুগের মানুষ ও জাতির হৃদয় পিষিয়া এই মতটা নিংড়াইয়া বাহির করিয়াছে। মতটা হইল এই যে, শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য মানুষকে জীবন-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা। অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য—মানুষকে এমন ভাবে গড়িয়া তোলা, যেন সে টিঁকিয়া থাকিয়া বংশরক্ষা করিয়া যাইতে পারে। এই মতটার আবির্ভাব মানব-সভ্যতার একটা tragedy। ইহা মনের উপর প্রাণের প্রতিশোধ। প্রাণের ঘরে ডাকাতি করিয়া মানুষ মনের ভোগের জন্য সভ্যতা গড়িয়াছে। কিন্তু ইহার দু'একটা সৃষ্টিকে আবার প্রাণের কাজে লাগাইতে গিয়া জীবনযাত্রাটা এমনই জটিল ও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে যে, মানুষ প্রাণ রাখিতে যে কেবল প্রাণান্ত হইতেছে তাহা নয়, একেবারে মনান্ত হইতেছে। মনের যা কিছু শক্তি ও ক্ষমতা এক প্রাণ রাখার কাজেই ব্যয় করিতে হইতেছে। ইহার বিরুদ্ধে ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়া কোনও লাভ নাই। যাহা জীবন হইতে ঠেলিয়া উঠিতেছে কেবল মত দিয়া তাহাকে চাপা দেওয়া চলে না। এ হইল

ভিড়ের ভিতর ঠেলার মত; ব্যাপারটা কেহ পছন্দ করে না, কিন্তু পিছু হটিবারও কাহারও সাধ্য নাই।

বর্ত্তমান যুগের মানুষের পক্ষে হয় তো এই জটিলতার হাত এড়ান অসাধ্য। এবং হয় তো বাধ্য হইয়াই বর্ত্তমান যুগের শিক্ষার্থীকে জীবন-যুদ্ধের জন্য তৈরী করাটাই শিক্ষার একটা প্রধান লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রাণের দাবীর স্বর যখন খুব চড়া হইয়া ওঠে তখন আর সব ফেলিয়া সেই দিকেই কাণ দেওয়া ছাড়া গতি নাই। কিন্তু আমরা যেন ভুলিয়াও না মনে করি যে এই বিসদৃশ ব্যাপারটাই হইল সভ্যতার উন্নতি। এ ভুলের আশঙ্কা আছে। কেননা মন আর ইন্দ্রিয়ের যে শক্তির প্রয়োগে মানুষ সভ্যতা গড়িয়াছে, আজ জীবনযাত্রার জটিলতায় সেই সব শক্তির উপরেই প্রাণ তাহার একাধিপত্যের দাবী পেশ করিয়াছে। ফলে মানুষের বুদ্ধি, কল্পনা, প্রতিভা ব্যয় হইতেছে অনেক, কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য কেবল প্রাণ বাঁচান ও জাত বাঁচান। ইহা সভ্যতা নয়, এ হইল সভ্যতা যে পথে চলে তাহার একবারে বিপরীত পথ। প্রাণের কাজে যাদের প্রথম প্রকাশ, মনের ভোগে তাদের শেষ পরিণতি হইল সভ্যতা। প্রাণের ব্যাগারে সমস্ত মনটাকেই নিঃশেষ করিয়া দেওয়া অসভ্যতা না হইতে পারে কিন্তু সভ্যতা নয়।

ফাল্গুন, ১৩২৩
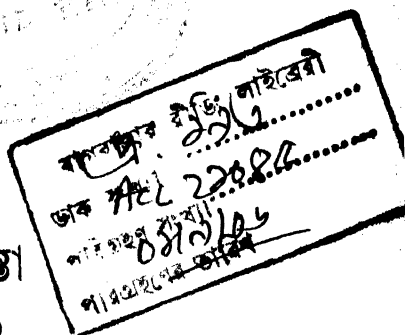
অন্নচিন্তা

(১)

আমাদের বৈশেষিকেরা বলেছেন অভাব একটী পদার্থ। এমন সূক্ষ্মদৃষ্টি না থাকলে কি আর তাঁদের চোখে পরমাণু ধরা পড়ে! আজ এই ঘোরতর অন্নাভাবের দিনে, অভাব যে একটা অতি কঠিন পদার্থ তাতে কে সন্দেহ করে? অথচ এই তত্ত্বটী প্রাচীন আচার্য্যেরা জেনেছিলেন যোগবলে। কেননা সেকালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরে যে অন্নাভাব ছিল না সে বিষয়ে একালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা একমত, আর বিলাতী সভ্যতাই যে দেশের সমস্ত রকম অভাবের মূল, অর্থাৎ ঐ সভ্যতার আমদানীর পূর্ব্বে যে দেশে কোনও কিছুরই অভাব ছিল না, এ তো আমাদের সকলেরই জানা কথা। সুতরাং কি ঘরে কি বাইরে, কোনও স্থানেই বৈশেষিক আচার্য্যেরা অভাবকে প্রত্যক্ষ করেন নাই। কাজেই সে সম্বন্ধে তাঁরা যে তত্ত্বটী প্রচার করেছেন সেটী পুরাণের ভবিষ্যৎরাজবংশাবলীর মত, আর সুশ্রুতের শারীর-স্থান-বিদ্যার মত সম্পূর্ণ ধ্যানলব্ধ সামগ্রী।

কুতার্কিক লোকে হয়তো এইখানে তর্ক তুল্‌বেন যে, বৈশেষিকেরা যে অভাবকে পদার্থ বলেছেন সে অভাবের অর্থ কেবল negation। আর পদার্থ মানে বস্তু নয়, বিলাতী দর্শনে যাকে বলে category তাই। এবং এই তত্ত্বটীর অর্থ মাত্র এই যে অভাব বা negation মনন-ব্যাপারের অর্থাৎ thought-এর একটা necessary ক্যাটিগরি। কিন্তু এই তর্ক আর কিছুই নয়, এ হ'ল হিন্দু-দর্শনের পবিত্র মন্দিরেও ম্লেচ্ছ সংস্পর্শ ঘটিয়ে তার জাত মার্‌বার চেষ্টা। নিশ্চয় জানি, কোনও খাঁটি হিন্দু এ সব তর্কে কাণ দেবেন না। সুতরাং এ তর্কের উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

প্রাচীনকালে যে ভারতবর্ষে অন্নাভাব ছিল না তার একটী অতি নিঃসংশয় প্রমাণ আছে। মাধবাচার্য্য তাঁর সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে ছোট বড় সমস্ত রকম দর্শনের বিবরণ দিয়েছেন। একটি পাণিণিদর্শনের বর্ণনা আছে, যাতে প্রমাণ করা হয়েছে যে ব্যাকরণ-শাস্ত্রই পরম পুরুষার্থের সাধন; ঐ শাস্ত্রে পারদর্শী না হ'লে সংসার-সাগর পারের আশা দুরাশা এবং ঐ শাস্ত্রই মোক্ষমার্গের অতি সরল রাজপথ। এমন কি একটী রসেশ্বর-দর্শন আছে, যাতে যুক্তি এবং শ্রুতি উভয় প্রমাণেই প্রতিপাদিত হ'য়েছে যে রস বা পারদই পরব্রহ্ম। রসার্ণব, রসহৃদয় প্রভৃতি প্রামাণিক দার্শনিক গ্রন্থ থেকে যুক্তি-প্রমাণ উদ্ধৃত হয়েছে; এবং রসজ্ঞেরা শুনে খুসি হবেন, যে শ্রুতি-প্রমাণটী আহৃত হ'য়েছে সেটী তাঁদের সুপরিচিত "রসো বৈ

সঃ রসো হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি” এই শ্রুতিবাক্য। এমন পুঁথিতেও অন্নদর্শন বলে’ কোনও দর্শনের বিবরণ দূরে থাক নাম পর্য্যন্ত নেই। এ থেকে কেবল এই অনুমানই সম্ভব যে, প্রাচীনকালে এদেশে অন্নাভাব না থাকায় অন্নচিন্তাও ছিল না, এবং বিষয়টা সম্বন্ধে একবারে চিন্তার অভাবেই এ বিষয়ে কোনও দর্শনের উদ্ভব হয়নি। কেননা ও-বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা থাক্‌লে যে তার একটা দর্শনও থাকৃত, তাতে বোধ হয় যে প্রমাণ দেখিয়েছি তারপর আর কোনও বুদ্ধিমান লোকে সন্দেহ কর্‌বেন না। এবং আমার এই যুক্তিটী যে সম্পূর্ণরূপে ‘বিজ্ঞানানুমোদিত ঐতিহাসিক প্রণালী সম্মত’ তাও নিশ্চয়ই সকলেই স্বীকার কর্‌বেন।

কিন্তু যখন বৈজ্ঞানিক-ঐতিহাসিকের উচ্চাসন একবার গ্রহণ করেছি তখন কোনও সত্যই গোপন কর্‌লে চল্‌বে না। অপ্রীতিকর হ’লেও সমস্ত কথাই প্রকাশ করে’ বল্‌তে হবে! অপ্রাচীন দার্শনিক যুগে যে দেশে অন্নাভাব ও অন্নচিন্তা ছিল না এ বিষয়ে সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহের প্রমাণ অকাট্য। কিন্তু ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখ্‌লে দেখা যাবে যে খুব প্রাচীন অর্থাৎ বৈদিক যুগে কিছু কিছু অন্নাভাব ছিল। কেননা শ্রুতিতে অন্ন সম্বন্ধে আলোচনা দেখা যায়। এর বিস্তৃত প্রমাণ দেওয়া অনাবশ্যক। একটা দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। ধরুন তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগু-বরুণের উপাখ্যান। বরুণের পুত্র ভৃগু যখন পিতার কাছে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ জিজ্ঞাসা কর্‌লেন তখন

বরুণ তাঁকে বলেন তপস্যার দ্বারাই ব্রহ্মকে জানা যায়, তুমি তপস্যা কর। তবে স্থবিধার জন্য ব্রহ্মের সম্বন্ধে একটা 'ফর্‌মুলা' বলে' দিলেন, 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি। তপস্যা করে' ভৃগু জান্‌লেন অন্নই ব্রহ্ম। অন্ন থেকেই সকলের জন্ম হয়, জন্মের পর অন্নের বলেই সকলে বেঁচে থাকে, অন্নের দিকেই সকলের গতি এবং শেষে অন্নেই সবাই লীন হয়, অতএব অন্নই ব্রহ্ম। ভৃগু এই জ্ঞানটুকু লাভ করে' পিতার কাছে গেলে বরুণ তাঁকে আবার তপস্যা কর্‌তে বল্‌লেন। দ্বিতীয়বার তপস্যায় ভৃগুর বোধ হ'ল প্রাণই ব্রহ্ম। এই রকমে তৃতীয়বারে জান্‌লেন মনই ব্রহ্ম। চতুর্থ বারে বুঝ্‌লেন বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। অবশেষে শেষবার তপস্যায় এই জ্ঞানে পৌঁছিলেন যে আনন্দই ব্রহ্ম। এই হ'ল ভৃগু-বরুণের গল্প, যাকে বলে 'ভার্গবী বারুণী বিদ্যা'। এই শ্রুতি সম্বন্ধে শঙ্কর ও অন্যান্য ভাষ্যকারেরা নানা তর্ক তুলেছেন, 'পঞ্চকোষ বিবেক' ও ঐ রকম সব দুর্ব্বোধ্য জটিলতার অবতারণা করেছেন কিন্তু এর প্রকৃত অথচ সহজ ইঙ্গিতটি কেউ ধর্‌তে পারেন নি। এই উপাখ্যানের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি এই নয় যে গোড়ায় অন্ন থাক্‌লে তবেই শেষ পর্য্যন্ত আনন্দ পাওয়া যায়! ইহাই যে শ্রুতির প্রকৃত মর্ম্ম ও শিক্ষা তাতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই, এবং একটু বিচার করে' দেখ্‌লে বোধ হয় পাঠকেরও কোনও সন্দেহ থাক্‌বে না। কেননা উপাখ্যানটী শেষ করে'ই শ্রুতি চারটী পরিচ্ছেদে কেবল অন্নেরই প্রশংসা করেছেন। এবং

তার মধ্যে এমন সব শ্রুতি আছে যাতে যে-কোনও 'ইকনমিষ্টের' প্রাণ আহ্লাদে নৃত্য করে' উঠ্‌বে। প্রকৃত ব্যাপারটা এই যে উপাখ্যানটি পড়্‌লেই বিংশশতাব্দীর জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোতে ওর প্রকৃত অর্থটা স্পষ্ট ধরা পড়ে; এবং শঙ্কর প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিকেরা কেন যে ওর যথার্থ মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারেন নি তার কারণও সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। পূর্ব্বেই প্রমাণ করেছি যে ঐ সব দার্শনিকদের সময়ে কোনও অন্নাভাব ও অন্নচিন্তা ছিল না। এবং তাঁদের যে কোনও historical sense বা 'ঐতিহাসিক অনুভূতি' ছিল না তা যাঁর ঐ sense বিন্দুমাত্র আছে তিনিই জানেন। সেইজন্য বৈদিক সময় যে তাঁহাদের সময়ের চেয়ে কিছুমাত্র অন্য রকম ছিল এটা তাঁরা কল্পনাই কর্‌তে পার্‌তেন না। ফলে বর্ত্তমান কালে আমরা যে higher criticism বা 'উচ্চতর অঙ্গের সমালোচনার' বলে প্রাচীনকালের মনের কথাটা একবারে ঠিকঠাক বুঝে' নিতে পারি, শঙ্কর প্রভৃতির সে সামর্থ্য ছিল না। অবশ্য ঐ সমালোচনা-প্রণালীর নামের higher বিশেষণটা যাঁরা ও-প্রণালীটা প্রবর্ত্তন করেছেন তাঁরাই দিয়েছেন, কিন্তু সত্যের খাতিরে বিনয়কে উপেক্ষা কর্‌বার মত সৎসাহস তাঁদের সকলেরই ছিল।

যা হোক পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনার ফলে এটা বেশ জানা গেল যে বৈদিক সময়ের পরে আর অন্নচিন্তায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বড় মাথা ঘামান নি। তাঁরা ব্রহ্মসূত্র রচনা করেছেন এবং কামসূত্রেরও অনাদর করেন নি, কিন্তু মাঝখান থেকে অন্নসূত্রটা

একেবারে বাদ দিয়েছেন। এর ফলভোগ কর্‌ছি আমরা, তাঁদের এ যুগের বংশধরেরা। আমাদের অন্নের অভাব অত্যন্ত বেশী, এবং কিসে ও-বস্তুটার কিছু সংস্থান হয় তার একটা মোটামুটী রকম মীমাংসারও বিশেষ প্রয়োজন; কিন্তু বহুযুগের বংশানুক্রমিক অনভ্যাসের ফলে ও-সম্বন্ধে চিন্তা বা আলোচনা কর্‌তে গেলেই গোলযোগ উপস্থিত হয়। তখন আমরা কে যে কি বলি তার কিছু ঠিক থাকে না। সেইজন্য আমাদের বাঙ্গলা-দেশে দেখা যায়, যিনি আইনের বিদ্যা ও বক্তৃতা বেচে টাকা জমিয়েছেন, তিনি সভায় দাঁড়িয়ে বাঙ্গালীর ছেলেকে ইস্কুল-কলেজে বৃথা সময় নষ্ট না করে' চট্‌পট্‌ ব্যবসা-বাণিজ্যে লেগে যেতে খুব জোরাল বক্তৃতা দেন। অবশ্য সেই ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলধনের জন্য তাঁর জমান টাকার কোনও অংশ পাওয়া যাবে না, কেন না তাঁর যে বংশধর ওকালতি কর্‌বে কিন্তু উপার্জ্জন কর্‌বে না তার জন্য সেটা সঞ্চিত থাকা নিতান্ত দরকার। এবং বলা বাহুল্য, যে শিল্প-বাণিজ্যে না ঢুকে' লেখাপড়া শিখে' চাকুরী খুঁজে বেড়ায় বলে' বাঙ্গলার যুবকেরা লেখায় ও বক্তৃতায় হিতৈষীদের গঞ্জনা শুন্‌ছে, সেই শিল্প ও বাণিজ্য দেশের কোথায় যে তাদের জন্য অপেক্ষা করে' বসে' আছে সেটা তাদের দেখান কেউ প্রয়োজন মনে করি নে। ভাবটা এই যে না-ই বা থাকুল বাঙ্গালীর ছেলের মূলধন, না-ই বা থাকুল দেশে তাদের জন্য কোনও শিল্প-বাণিজ্য, তারা কেন প্রত্যেকেই বিনা মূলধনে আরম্ভ করে' নিজের চেষ্টায় এক একটা শিল্পের বড় বড় কারখানা

গড়ে' তোলে না, বড় রকম ব্যবসার মালিক হ'য়ে বসে না। কেননা কোনও কোনও দেশে কোনও কোনও লোক যে কদাচিৎ ঐ রকম ব্যাপার করেছে, তা ত পুঁথিতেই লেখা আছে। তারপর আমাদের এই অন্ন-সমস্যার সমাধানের জন্য ইস্কুল-কলেজ সব তুলে' দিয়ে সে জায়গায় কৃষিপরীক্ষাশালা ও শিল্প-বিদ্যালয় খোলাই যে একমাত্র উপায় সে বিষয়ে কেউ যুক্তি-তর্ক দেখান; আর যাঁরা কাজের লোক তাঁরা যে-হয় কোনও ছেলেকে, যা-হোক কিছু একটা শিখে' আস্‌বার জন্য, যে একটা হোক বিদেশে যাওয়ার জাহাজ-ভাড়া সাহায্যের জন্য চাঁদার খাতায় স্বাক্ষর করাতে আরম্ভ করেন। আর এ যুগের বাঙ্গালীর ছেলেও হয়েছে এক অদ্ভুত জীব। বর্ত্তমানে ধনে-জনে যে জাতি পৃথিবীর মাথায় বসে' আছেন শোনা যায়, বুকের মধ্যে তাঁদের হৃৎপিণ্ডে পৌঁছিতে হ'লে তাঁদের গায়ের জামার অংশবিশেষের ভিতর দিয়েই তার সোজা, এবং মন্দ লোকে বলে একমাত্র পথ। বাঙ্গালীর ছেলের অবস্থাটা ঠিক উল্টো। নিজের পকেট সম্বন্ধেও খুব বেশী সজাগ ও উৎসাহান্বিত কর্‌তে হ'লে, এদের একেবারে বুকের মধ্যে ঘা না দিলে কোনই ফল পাওয়া যায় না। দেশী শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া যে দেশের ধনবৃদ্ধির ও ধনরক্ষার জন্য একটা 'টারিফের' প্রাচীর মাত্র, 'পলিটিক্যাল্ ইকনমি' নামক বিজ্ঞান শাস্ত্রের যুক্তি-তর্ক এবং মহাজনের খাতার হিসাব-নিকাশেরই বিষয়, তা এরা কিছুতেই বুঝ্‌তে চায় না, এবং বুঝ্‌লেও তাতে কোনও ফল হয় না। এরা চায় গান আর কবিতা যার

বিষয় হচ্ছে দেশের উত্তরের হিমালয়ের মাথার বরফের মুকুট, দক্ষিণের নীল সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ, এবং যখন সমস্ত পৃথিবী মূক ছিল তখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে সামগানে সিন্ধু সরস্বতীর তীর ধ্বনিত করেছিলেন, সেই কাহিনী। অথচ এরা যে হাতে কলমে কাজে লাগ্‌তে পারে না বা কাজ উদ্ধার কর্‌তে পারে না, এমন নয়। এরা অর্দ্ধোদয়-যোগে দেশের দীন-তমকেও নারায়ণের পূজায় সেবা করে এবং শৃঙ্খলার সঙ্গেই করে; বন্যার জলে চালের বস্তা পিঠে নিয়ে সাঁতার দেয়, এবং কোনও 'ডিপার্ট্‌মেণ্টের' বিনা চালনায় অনুষ্ঠানটী যেমন করে' নির্ব্বাহ করে, তাতে কাজের চেয়ে কাজের শৃঙ্খলাই যাদের গর্ব্বের প্রধান বিষয়, সেই 'ডিপার্ট্‌মেণ্টের' কর্ত্তাদেরও কতক বিস্ময় কতক সন্দেহের উদ্রেক হয়; জাতির একটা দুর্নাম ঘোচাবার জন্য এরা তুর্কীর গুলিতে টাইগ্রিসের তীরে প্রাণ দিতে রাজী হয়, এবং তার শিক্ষানবীশিতে পূব-পশ্চিমের কোনও জাতির চেয়ে কম পটুতা দেখায় না। কিন্তু এ ত অতি স্পষ্ট যে এ সকলই কেবল ভাবের খেলা, এর মধ্যে বস্তুতন্ত্রতা কিছুই নেই। প্রকৃত কাজের বেলায় এদের চরিত্রে কোনও গুণই দেখা যায় না। এরা কিছুতেই উপলব্ধি করে না যে খুব দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা ও একনিষ্ঠার সঙ্গে আরম্ভ করে', সংসারযুদ্ধে জয়ী হ'য়ে দশের এক হওয়াই সব চেয়ে বড় কাজ, চরিত্রের সব চেয়ে বড় পরীক্ষা। সেইজন্য যদিও বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষার পুঁথিতে এদের সেই সব মহাপুরুষদের জীবনী পড়ান হয় যাঁরা খুব হীন

অবস্থা থেকে পরিশ্রম, অধ্যবসায় প্রভৃতি বহু সদ্‌গুণের সদ্ব্যবহারে নিজেদের অবস্থা খুব বেশীরকম ভাল করেছিলেন; এবং ইংরেজী হাতের লেখা লিখ্‌তে আরম্ভ করে'ই সময় আর টাকা যে একই জিনিষ 'কপিবুক' থেকেই এরা সে অদ্বৈত-জ্ঞান লাভ করে, তবুও কিছু বড় হ'লেই এই পুস্তকস্থা-বিদ্যার ফল এদের স্বভাবে কিছু দেখা যায় না। তখন বাল্যশিক্ষার পুঁথির মহাজনদের অনুরূপ যে সব কৃতকর্ম্মা পুরুষ, সমাজে সশরীরেই বর্ত্তমান এরা তাঁদের কোনও খবরই রাখে না, এমন কি তাঁরা দেশের রাজার কাছে খুব উঁচু সম্মান পেলেও নয়। যারা কেবল কথার সঙ্গে কথা গাঁথ্‌তে পারে, বা লজ্জাবতীর পাতায় তামার তার জড়ায়, এরা তাদের নিয়েই অসঙ্গত রকম হৈ চৈ করে। অন্নচিন্তায় যে এরা কাতর নয়, কি অন্নচেষ্টা যে এদের উত্তেজিত করে না তা নয়। সে চিন্তায় এরা যথেষ্টই ক্লিষ্ট; সে চেষ্টায় এরা অনেক দুঃখ, অনেক অপমানই সহ্য করে। কিন্তু সে সব সত্ত্বেও ঐ চিন্তা আর ঐ চেষ্টাকেই পরমোৎসাহে সমস্ত মন দিয়ে বরণ করে' নিতে কিছুতেই এদের মন সরে না। এদের ভাব কতকটা এই রকম যে রোগ যখন হয় তখন ডাক্তারও ডাক্‌তে হয়, ঔষধও গিল্‌তে হয় এবং হাঙ্গামও কিছু কম হয় না। এবং যে চিররোগী, সমস্ত জীবনই বাধ্য হ'য়ে তাকে এই হাঙ্গাম সইতে হয়। কিন্তু তাই বলে' রোগের চিকিৎসাকেই সব চেয়ে বড় উৎসাহের ব্যাপার করে' তোলা সম্ভবপর নয়।

আমরা বাঙ্গলা দেশের ছেলে বুড়ো অন্নচিন্তার ব্যাপারে সবাই যে এই সব আশ্চর্য্য ও অস্বাভাবিক কাণ্ড করি, পূর্ব্বেই বলেছি এতে আমাদের দোষ কিছু নেই। দোষ পূর্ব্বপুরুষদের যাঁরা ও-সম্বন্ধে সুচিন্তা ও মনের কোন স্বাভাবিক ঝোঁক রক্ত-মাংসের সঙ্গে আমাদের দিয়ে যেতে পারেন নি। এই দায়িত্ব-হীনতার সাহসেই এই প্রবন্ধও সুরু করেছি। কেননা জানি, বেফাঁস কথা যা কিছু বল্‌ব তাতে আমার নিজের দায়িত্ব কিছুই নেই। দায়ী সেই পিতৃপুরুষেরা যাঁরা পিণ্ডের আশা করেন কিন্তু পিণ্ডের অন্ন সম্বন্ধে একনিষ্ঠ হ'য়ে চিন্তা কর্‌বার মতন মনের বা মগজের অবস্থা নিজেদের না থাকায় আমাদেরও দিয়ে যেতে পারেন নি।

(২)

দেশের প্রাচীন আচার্য্যেরা যখন অন্ন সম্বন্ধে চিন্তাই করেন নি, তখন সে চিন্তায় কিছু সাহায্য পেতে হ'লে পশ্চিমের আধুনিক যবনাচার্য্যদের কাছেই যেতে হয়। এঁদের মধ্যে একদল আছেন যাঁরা অন্ন-জিজ্ঞাসারই একটা স্বতন্ত্র শাস্ত্র গড়ে' তুলেছেন। কিন্তু অন্ন সম্বন্ধে যিনি সব চেয়ে ব্যাপক অথচ গভীর ভাবে চিন্তা করেছেন তিনি এই অন্ন-শাস্ত্রের শাস্ত্রী নন, তিনি একজন প্রাণতত্ত্ববিদ্‌ আচার্য্য, নাম চার্লস্‌ ডার্‌উইন। ভৃগু-বরুণ প্রসঙ্গের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে অন্নতত্ত্বের এক ধাপ উপরে উঠ্‌লে পাই প্রাণতত্ত্ব। সুতরাং প্রাণতত্ত্বজ্ঞ

ডার্‌উইন যে তাঁর উপরের ধাপ থেকে অন্নের লীলা ব্যাপকতর ও স্পষ্টতর ভাবে প্রত্যক্ষ কর্‌বেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

ডার্‌উইন পূর্ব্বাচার্য্যদের কাছ থেকেই অন্নপ্রাণ-বিদ্যার এই বীজমন্ত্রটী পেয়েছিলেন যে পৃথিবীতে যত প্রাণী জন্মে তাদের সকলের প্রাণরক্ষার উপযোগী পর্য্যাপ্ত অন্ন বসুমতী যোগাতে পারেন না। কিন্তু এই প্রাচীন মন্ত্রই বহু বৎসর ধরে' একান্ত নিষ্ঠা ও কঠোর সংযমের সঙ্গে জপ কর্‌তে কর্‌তে পূর্ব্বে যা কারও ভাগ্যে ঘটে নি তাঁর সেই সিদ্ধি লাভ হ'ল। অন্ন তাঁর অদৃষ্টপূর্ব্ব বিশ্বরূপ ডার্‌উইনকে দেখালেন। তিনি দেখ্‌লেন স্থলে, জলে, আকাশে—অরণ্যের ছায়ায়, মরুভূমির প্রান্তে, গাছের শাখায়, পর্ব্বতের গহ্বরে, সমুদ্রের তলে, হ্রদের বুকে—অন্নের জন্য প্রাণের এক অবিশ্রান্ত দ্বন্দ্ব চলেছে। অন্ন পরিমিত, তার আকাঙ্ক্ষী জীব সংখ্যাহীন। এই পরিমিত অন্নকে আয়ত্ত করার জন্য প্রাণীতে প্রাণীতে, উদ্ভিদে উদ্ভিদে, উদ্ভিদে প্রাণীতে যে দ্বন্দ্ব, তা যেমন বিরামহীন তেমনি মমতাহীন। এ দ্বন্দ্বে কেহ কারও সহায় নয়। এ হ'ল সকলের সঙ্গে প্রত্যেকের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব কখনও প্রকাশ হচ্চে প্রকাশ্য যুদ্ধের রক্তোচ্ছ্বাসে, কখনও নিঃশব্দে চলেছে নীরব রক্তশোষী প্রতিযোগিতার আকারে। কোন্‌টা বেশী ভয়ানক বলা কঠিন। অন্ন তাঁর মোহিনী মূর্ত্তিতে প্রাণকে আকর্ষণ করেছেন, আর আকৃষ্ট প্রাণীকে মহাকালের মূর্ত্তিতে সংহার কর্‌ছেন। শেষ পর্য্যন্তও যাদের উপর প্রসন্ন দৃষ্টি রাখ্‌ছেন সেই ভাগ্যবানদের সংখ্যা অতি সামান্য। মৃত্যুর

মরুভূমির উপর দিয়ে অন্ন তাঁর সম্মোহন শঙ্খ বাজিয়ে চলেছেন। প্রতি মুহূর্ত্তে প্রাণের জোয়ারে দুকূল ছাপিয়ে উঠ্‌ছে, কিন্তু সে উচ্ছ্বাস দু'পাশের তপ্ত বালুতেই শুষে' নিচ্ছে। প্রাণের একটা অতি ক্ষীণ ধারা কোনও রকমে শেষ পর্য্যন্ত অন্নের পিছনে পিছনে চলেছে।

অন্নের এই মোহিনীমহাকালের যুগলমূর্ত্তি দর্শন করে' ডার্‌উইন কাল জয় করে' অমর হয়েছেন। কিন্তু প্রাণের সঙ্গে অন্নের লীলার এখানেই শেষ নয়। প্রাণের ধারা চল্‌তে চল্‌তে একদিন মানুষে এসে ঠেক্‌ল। পৃথিবীতে প্রাণের ক্রমবিকাশ হ'তে হ'তে একদিন তা মানুষের মূর্ত্তি নিয়ে প্রকাশ হ'ল। কেমন করে' হ'ল সে কথা পণ্ডিতদের তর্ককোলাহলে অপণ্ডিত সাধারণের কাণে আসা দুঃসাধ্য; তাতে আমাদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এবার যে বিগ্রহে প্রাণের প্রতিষ্ঠা হ'ল, সে বিগ্রহ অতি মনোরম, অতি বিস্ময়কর। তার সুঠাম, সরল, উন্নত দেহ, তার বন্ধনহীন মুক্ত বাহু, তার সতেজ ইন্দ্রিয়, তার সবল, অনাড়ষ্ট মাংসপেশী সবই যেন স্পষ্ট করে' বলে' দিল যে এ বিগ্রহ অরণ্যে পড়ে' থাক্‌বার নয়, এর জন্য একদিন সোণার দেউল গড়া হবেই হবে। তবুও প্রাণের এই প্রকাশের সব চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার তার এই মূর্ত্তি নয়। তার চেয়েও লক্ষগুণে আশ্চর্য্য এক ব্যাপার সংঘটিত হ'ল। যে মন বোধ হয় পৃথিবীতে প্রাণের যাত্রারম্ভের সঙ্গেই তার সাথে ছিল, অতি ক্ষীণ অদৃশ্যপ্রায় অবস্থা থেকে নানা মূর্ত্তির মধ্য দিয়ে অতি ধীরে ধীরে

ক্রমে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ছিল, মানুষের মূর্ত্তিতে পৌঁছে সে একবারে দীপ্ত সূর্য্যের মতন জ্বলে' উঠ্‌ল। তার উজ্জ্বল দীপ্তিতে মানুষ পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখ্‌ল যে এ বিপুল ধরিত্রী তারি রাজত্ব।

অন্ন তাঁর নিজের শক্তি সেইদিন পূর্ণরূপে উপলব্ধি কর্‌লেন যেদিন এই মানুষও, রাজটীকা ললাটে নিয়ে, কাঙালের মত তাঁর পিছু পিছু পৃথিবীময় ছুটে বেড়াতে লাগ্‌ল। একটা ফলের জন্য দশটা গাছের তলায়, একটা শিকারের খোঁজে এক অরণ্য হ'তে আর এক অরণ্যে ঘুরে ঘুরে, পরে অন্নকে কিছু সুলভ করে' একটু সুস্থির হওয়ার চেষ্টায় গোটাকয়েক প্রাণীকে যদি পোষ মানাল, তবে সেই প্রাণীরূপ অন্নের অন্ন খুঁজ্‌তে এক দেশ হ'তে আর এক দেশে চল্‌তে চল্‌তে তার পায়ে ব্যথা ধরে' উঠ্‌ল। এই অজ্ঞাতবাসের দুঃসহ দৈন্যে মানুষের বহু যুগ কেটে গেল। শেষে এক দিন পরম শুভক্ষণে ক্লান্তদেহ, ক্ষুব্ধচিত্ত মানুষ বলে' উঠ্‌ল আর অন্নের আশায় তার পিছু পিছু ঘুরে' বেড়াব না,— অন্নকে সৃষ্টি কর্‌ব, স্বল্প অন্নকে বহু কর্‌ব। সেদিন নিশ্চয়ই স্বর্গের তোরণে মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠেছিল; দিব্যাঙ্গনারা মর্ত্ত্যচক্ষুর অদৃশ্য হেমঘটে অভিষেকবারি এনে মানুষের মাথায় ঢেলেছিলেন; ইন্দ্রদেব এসে সোণার রাজমুকুট তার মাথায় পরিয়েছিলেন; আর সমস্ত আকাশ ঘিরে দেবতারা প্রসন্ন নেত্রে দীর্ঘ বনবাসের পরে মানুষের নিজ রাজ্যে অভিষেক চেয়ে দেখেছিলেন।

কৃষি আরম্ভ হ'ল। প্রাণের ধাপ থেকে মনের ধাপে উঠে মানুষ দেখ্‌ল যে এখানে দাঁড়ালে অন্ন এসে আপনিই হাতে

ধরা দেয়, তাকে পৃথিবীময় খুঁজে বেড়াতে হয় না। এখানে বসে' তপস্যা কর্‌লে কালো মাটীর বুক চিরে সোণার ফসল বাইরে এসে পৃথিবী ঢেকে ফেলে; দিনের অন্ন দিন খুঁজে প্রাণান্ত হ'তে হয় না। মানুষ জান্‌ল, 'পৃথিবী বা অন্নম্', পৃথিবীই অন্ন। মাটীর তলে জলের অফুরন্ত ধারার মত মাটীর মধ্যে অন্নেরও অফুরন্ত ভাণ্ডার লুকান আছে; লাঙ্গলের ফালে তাকে তুলে আন্‌তে জান্‌লে অন্নের দৈন্য দূর হয়; যে মন্ত্র ডারউইন জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার শক্তিকে ব্যর্থ করা যায়। মাটীর সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপন হ'ল। মাটীর টানে উদ্‌ভ্রান্ত বনচারী গৃহী হ'ল। সেইদিন মানুষের স্বদেশ, সমাজের প্রতিষ্ঠা হ'ল, মানুষের গ্রাম নগর গড়ে' উঠ্‌ল, শিল্প বাণিজ্যের সুরু হ'ল। পৃথিবীর আদিম অরণ্য কেটে সভ্যতার সোণার মন্দিরে মানুষের প্রতিষ্ঠা হ'ল।

কিন্তু প্রাণের ভূমি থেকে আরম্ভ করে' মানুষের এই যে যাত্রা, এখানেই তার শেষ হয় নাই। মন যখন সৃষ্টির ক্ষমতায় পরিমিত অন্নকে বহু করে' অন্নের দাসত্বের লোহার বেড়ি মানুষের পা থেকে খুলে নিল, বিরামহীন অন্নচেষ্টা থেকে তাকে মুক্তি দিল, তখনই মানুষের স্বভাবের যেটি পরমাশ্চর্য্য অংশ, সেটির বিকাশ হ'ল। মানুষ দেখ্‌ল যে কেবল অন্নে তার তৃপ্তি নাই,—তার পরিমাণ যতই অপর্য্যাপ্ত হ'ক, তার প্রকার যতই বিবিধ হ'ক। প্রাণের তাড়নায় অন্নের খোঁজে আকাশ, বাতাস, পৃথিবীকে জান্‌তে আরম্ভ করে' মানুষ বুঝ্‌ল যে তার

স্বভাবে একটা কি আছে যেটা কেবল জানার দিকে তাকে ঠেলে দেয়। অন্নের সৃষ্টি আরম্ভ করে' সে জান্‌ল যে তার প্রকৃতির যেটা অন্তরতম অংশ, সেটা কেবল সৃষ্টির আনন্দেই সৃষ্টি করে' যেতে চায়। মানুষ যেন প্রাণিরাজ্যের রাজা হ'লেও অপ্রাণ-লোকেরই অধিবাসী। সে যেন বিদেশী রাজপুত্র পরদেশে এসে রাজত্ব পেয়েছে, কিন্তু তার অন্তরাত্মার নাড়ীর টান স্বদেশের দিকেই। প্রাণের জগতে মানুষের এই যে উদ্দেশ্যহীন জানা আর অনাবশ্যক সৃষ্টি তাই হ'ল তার বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম, কাব্য, কলা, শিল্প। মানুষের প্রাণ বলে' এদের মূল্য এক কানা কড়িও নয়; তার অন্তর জানে এরাই তার যথাসর্ব্বস্ব, অন্নের চেয়েও কাম্য, প্রাণের চেয়েও প্রিয়।

এই হ'ল মানুষের সভ্যতার অন্ন আর প্রাণের ভূমি থেকে মনের সিড়ি দিয়ে বিজ্ঞান আর আনন্দলোকে যাত্রার ভ্রমণ-কাহিনী। এই লোকে পৌছিলেই অন্নের দাসত্ব থেকে মানুষের যথার্থ মুক্তি। মানুষ যদি কেবল অন্নকে আয়ত্ত ক'রেই নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার্‌ত তা হ'লে অন্ন-দাস হ'লেও মানুষের জীবনে তার সর্ব্বব্যাপী প্রভুত্বের কোনও অপচয় হ'ত না। সোনার শিকলে অন্নকে বাঁধ্‌লেও শিকলের অন্য দিকটা মানুষের গলাতেই পরান' থাকৃত, অন্নের টানে পৃথিবীময় না ঘুর্‌তে হ'লেও সারাক্ষণ অন্নকে টেনেই পৃথিবীতে চল্‌তে হ'ত। এই বিজ্ঞান আর আনন্দলোকে পৌছিতে জান্‌লেই মানুষের গলা থেকে এই অন্নের শিকল খোলার উপায় হয়।

আমাদের ঋষিরা সংসারচক্র থেকে জীবের মুক্তির কথা বলেছেন। এই হ'ল মানুষের সভ্যতার অন্নচক্র থেকে মুক্তির পথ।

(৩)

যদি কারু মনে হয় যে মনের বলে মানুষের আয়ত্ত হ'য়ে, তাকে বিজ্ঞান আর আনন্দের পথের যাত্রী দেখে, মানব-জীবনের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে', অন্ন চিরদিনের জন্য নিশ্চেষ্ট হয়ে গেছে, তবে তিনি অন্নের প্রভাব এবং মাহাত্ম্যের কথা কিছুই জানেন না। মানুষের সভ্যতার যে যে মুক্তির কথা বলেছি সে হ'ল শাস্ত্রে যাকে বলে জীবন্মুক্তি, অর্থাৎ দেহও আছে, মুক্তিও হয়েছে। সুতরাং মানুষের দেহ আর প্রাণ যখন আছে তখন তার অন্নের উপর একান্ত নির্ভর আছেই আছে। এই ছিদ্র ধরে' অন্ন অতি নিপুণ সেনাপতির মত এক নূতন পথ দিয়ে তার বল চালনা করে' মানুষকে বন্দী কর্‌বার চেষ্টা করেছে। প্রাচীন দ্বন্দ্বটা চলেছে, কেবল অবস্থার পরিবর্ত্তনে 'ষ্ট্র্যাটেজির' প্রভেদ ঘটেছে মাত্র।

যতদিন মানুষ কেবল প্রাণী ছিল, তার মনের পূর্ণ বিকাশ হয় নি, বিজ্ঞান ও আনন্দলোকের বার্ত্তা তার অজ্ঞাত ছিল, ততদিন অন্নের দৃষ্টি ছিল মানুষের প্রাণের উপর। যেমন ইতর প্রাণীকে তেমনি মানুষকেও নিজের রথের চাকায় বেঁধে, অন্ন তার জীবন-মৃত্যুর উপর কর্ত্তৃত্ব কর্‌ত। এই যুদ্ধে অন্ন জয়ী

হয়েছিল নিজেকে বিরল করে', আপনাকে দুর্লভ করে'। মানুষের মন যখন অন্নকে বহু ও সুলভ করে' এই উপায়টা ব্যর্থ করল সেইদিন থেকে অন্নের দৃষ্টি পড়েছে মানুষের বিজ্ঞান ও আনন্দ-লোকের দিকে। অন্ন জানে যে ওরাই তার প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষের জীবনে যদি ওদের আবির্ভাব না হ'ত, তা হ'লে নামে প্রভু হ'লেও রোমের শেষ সম্রাটদের মত মানুষ দাস-অন্নের দাসত্বই করত। কাজেই অন্নের এখন চেষ্টার বিষয় হ'য়েছে মানুষের সভ্যতার ঐ বিজ্ঞান আর আনন্দের লোকটা ধ্বংস করা। আর প্রাণকে আয়ত্ত করার প্রাচীন চেষ্টার ব্যর্থতার মধ্যেই অন্ন এই নূতন যুদ্ধের অস্ত্র খুঁজে পেয়েছে। দুর্লভ অন্নকে বহু করে' মানুষ সভ্যতা গড়েছে। এই বহু অন্ন অসংখ্য মোহিনী মূর্ত্তিতে মানুষকে ঘিরে তার বিজ্ঞান আর আনন্দলোকের পথরোধের চেষ্টা করছে। বিরলতার ক্ষয়রোগে মানুষের সভ্যতাকে ধ্বংস করতে না পেরে বাহুল্যের মেদরোগে তার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াটা বন্ধ করবার চেষ্টা দেখছে। অন্ন এখন মহাকালের মূর্ত্তি ছেড়ে কুবেরের মূর্ত্তি ধরেছে। মানুষের কত সভ্যতা মহাকালের করাল দংষ্ট্রা হ'তে উদ্ধার পেয়ে স্থূলোদর ভোগপ্রসন্নমুখ কুবেরের মেদপুষ্ট বাহুর আলিঙ্গনের মধ্যে নিশ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে মরেছে!

মানুষের সভ্যতার সঙ্গে অন্নের এই দ্বন্দ্ব নূতন নয়, এ দ্বন্দ্ব অতি প্রাচীন। সভ্যতার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই এ দ্বন্দ্বেরও আরম্ভ হ'য়েছে এবং বোধ হয় শেষ পর্য্যন্তই চলবে। কখনও সভ্যতা

জয়ী হ'য়েছে, কখনও বা অন্নেরই জয় হ'য়েছে। মানুষে মানুষে শেষ যুদ্ধের বর্ত্তমান কল্পনার মত এ যুদ্ধের শেষ কল্পনাও হয়ত কেবল স্বপ্ন। হয়ত মানুষের সভ্যতাকে চিরদিনই এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে উঠে পড়ে' চল্‌তে হবে।

এই চিরন্তন দ্বন্দ্বের মধ্যে মানুষের সভ্যতা রক্ষা পেয়েছে, কেননা যুগে যুগে এমন সব জাতি উঠেছে যারা অন্নের মায়াকে অতিক্রম করে' আনন্দের পথে চল্‌তে পেরেছে। ভুল হ'তে পারে, কিন্তু আমার বিশ্বাস আধুনিক বাঙ্গালী সেই সব জাতির অন্যতম। সভ্যতার এই প্রাচীন যুদ্ধে নবীন সেনাপতি হবার যোগ্যতা এদের মধ্যে আছে। অন্নের মহাকাল-মূর্ত্তিতে ভয় পেয়ে যাঁরা এই জাতিকে কুবেরের কোলে তুলে' দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চান, তাঁদের মাথায় বুদ্ধি থাক্‌তে পারে, কিন্তু চোখে দৃষ্টির অভাব। আনন্দলোকের সূর্য্যরশ্মি বিজয়মাল্যের মত এদের মাথায় এসে পড়েছে; হিতৈষিদের শত চেষ্টাতেও সে বরণকে উপেক্ষা করে' কেবল অন্নকে বহু করার চেষ্টাতেই এ জাতি কখনও জীবন উৎসর্গ কর্‌তে পার্‌বে না।

"অন্নং ন নিন্দ্যাৎ"; অন্নের নিন্দা করি নে। "অন্নং বহুকুর্ব্বীত"; অন্নকে বহু করার যে কত প্রয়োজন তাও জানি। সেই ভিত্তির উপরেই মানুষের সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে। সমস্যা এই, কেমন করে' অন্নকেও বহু করা যায় আবার তার বাহুল্যকেও বর্জ্জন করা যায়। মহাকালের দশনেও ছিন্ন হ'তে না হয়, কুবেরের গদাও চূর্ণ না করে।

অন্নচিন্তা

এস নূতন যুগের নবীন বাদরায়ণ! 'অথাতোঽন্ন জিজ্ঞাসা' বলে' তোমার অন্নসূত্র আরম্ভ করে' এই সংশয়ের সমাধান কর। কোন্ মধ্যযান পথের পথিক হ'লে মানুষের সভ্যতাকে আর আনন্দের ব্রহ্মলোক হ'তে ফিরে আস্‌তে না হয় তার নির্দ্ধারণ কর।

আশ্বিন, ১৩২৪

রোম।

(১)

জোর করে' লেগে থাক্‌লে দেখ্‌ছি অসাধ্যও সাধন করা যায়। এভ্‌রিম্যানের অনুবাদে চার ভ্যলুম মম্‌সেনের রোমের ইতিহাস শেষ হ'য়ে গেল। অবশ্য এ পুঁথির শেষে পৌছে দেখি গোড়ার দিক্‌কার অনেক কথা, মনের মধ্যে ঝাপ্‌সা হ'য়ে এসেছে। কেল্টজাতির স্বাধীনতা রক্ষার নিষ্ফল চেষ্টার করুণ কাহিনী, স্যাম্‌নাইটদের রোমের নাগপাশ থেকে মুক্তির বৃথা প্রয়াসের ইতিহাসকে একরকম ঢেকে ফেলেছে। সিরাজের জয়ধ্বনিতে, হ্যানিবালের স্তুতিগানও প্রায় ডুবে গেছে। সন তারিখের ত কথাই নাই। প্রথম থেকেই তার গোলযোগ সুরু হয়েছে, এবং শেষ পর্য্যন্ত সব একাকার হয়ে গোলযোগের সম্ভাবনারও লোপ ঘটেছে। মোট কথা, রোমের ইতিহাসে পরীক্ষা দিতে বস্‌লে যে, সে পরীক্ষাতে ফেল হব এটা নিশ্চয়। তবুও ল্যাটিন জাতির বিজয় যাত্রার এই অধ্যায়গুলি, মম্‌সেনের বর্ণনায় মনের মধ্যে যে দাগ কেটে গেছে, তা সহসা মুছে যাবে না। ভূ-মধ্য-সাগরের চার পাশের যে ভূ-খণ্ডকে আধুনিক যুগের রোমের ঐতিহাসিকেরা ও পৃথিবী বলেই উল্লেখ করেন, তার বহু রাজ্য ও

বিচিত্র জাতিগুলির উপর রোমের এক-রাট্ ও একছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, মনকে যে দোলা দিয়েছে, তার বেগ শেষ হ'তে কিছু সময় লাগ্‌বে।

পাঠকেরা শঙ্কিত হবেন না। মম্‌সেন থেকে দুটো অধ্যায় ইংরেজি অনুবাদের বাঙ্গলা তর্জ্জমা করে' দিয়ে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকপদ লাভের কোনও চেষ্টাই কর্‌ব না। রোম সম্বন্ধে এখানে যা কিছু বল্‌তে যাচ্ছি তা নিতান্তই এলোমেলো রকমের। তাতে প্রত্ন-তত্ত্বের পাণ্ডিত্য এবং ইতিহাসের গাম্ভীর্য্য—এ দু'য়ের অত্যন্ত অভাব। সুতরাং যাঁরা প্রবন্ধের নাম দেখে পড়্‌তে সুরু করেছেন তাঁরা হয়ত আর অগ্রসর না হ'লেই ভাল কর্‌বেন। আর যাঁরা নাম দেখেই পাতা উল্টে যেতে চাচ্ছেন, তাঁরা একবার শেষ পর্য্যন্ত পড়্‌বার চেষ্টা কর্‌লেও কর্‌তে পারেন।

(২)

প্রাচীন হিন্দুজাতি এবং তাদের সভ্যতা আমাদের পশ্চিমের মাষ্টার ম'শায়দের কাছে অনেক রকম গঞ্জনা শুনেছে। তিরস্কারের একটা প্রধান বিষয় এই যে বংশপরিচয়ে তাঁরাও ছিলেন রোমানদেরই জ্ঞাতি। সুতরাং সেই একই রক্ত শরীরে থাক্‌তে তাঁরা যে কেমন করে হিন্দু-সভ্যতার মত এমন দুর্ব্বল ও বিকৃত সভ্যতা গড়ে' বস্‌লেন, এটা পণ্ডিতদের মনে যেমন বিরাগেরও সঞ্চার করেছে তেম্‌নি জিজ্ঞাসারও জন্ম দিয়েছে। এবং এই সংশয়ের সমাধানে তাঁরা নানা রকম সম্ভব অসম্ভব,

অবশ্য সকলগুলিই 'বৈজ্ঞানিক', মতবাদের প্রচার করেছেন। গল্প আছে, ইংলণ্ডের দ্বিতীয় চার্লস্ রয়েল সোসাইটীর নতুন প্রতিষ্ঠা করে' পণ্ডিতদের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্লেন যে, মাছ মর্লেই ঠিক সেই সময়টা তার ওজন বেড়ে যায় কেন? পণ্ডিতেরা উত্তর খুঁজে গলদঘর্ম্ম হ'য়ে গেলেন। অবশেষে একজন বল্লেন, আচ্ছা দেখাই যাক্ না ওজন করে', মাছটা মর্লেই তা যথার্থ বেশী ভারী হ'য়ে ওঠে কিনা। মম্‌সেনের বিপুলায়তন পুঁথি শেষ করে' এই কথাটাই বারবার মনে হয়েছে, যে যাঁরা এই রোমান-সভ্যতার তুলনায় প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতাকে অতি খাটো ও নিতান্ত হাল্কা বলেছেন, 'সভ্যতা' বল্‌তে তাঁরা কি বোঝেন? সভ্যতার কোন্ মাপকাটিতে তাঁরা এই দুই সভ্যতাকে মাপ করেছেন? কোন্ তৌলে এদের ওজনে তুলেছেন? এই যে রোমান-সভ্যতা, যার গৌরবের দীপ্তিতে পণ্ডিতদের চোক ঝল্‌সে গেছে, এ ত একটা একটানা পরের দেশ জয় ও অন্য জাতির উপর আধিপত্য স্থাপনের ইতিহাস। প্রথম 'লেশিয়ামের' উপর রোমের প্রভুত্ব বিস্তার, তারপর তারি সাহায্যে উত্তরের ইট্রাস্‌কানদের ধ্বংস করে' ইতালীর আর সকল জাতিগুলোকে পিষে ফেলে গোটা দেশটায় নিজের আধিপত্য স্থাপন। আবার মেডিটারেনিয়ানের ওপারের প্রবল রাজ্যটী, সিসিলির সেতু পার হ'য়ে এই আধিপত্যের কোনও বিঘ্ন ঘটায়, এই আশঙ্কাতেই কার্থেজের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে বিজিত ইতালীর সাহায্যে তাকে সমূলে উচ্ছেদ; এবং কার্থেজের

অধিনায়ক 'হ্যামিলকার বার্কা' বা বিদ্যুতের বংশধর, স্পেন থেকেই যাত্রা সুরু করে' বজ্র হ'য়ে রোমের মাথায় ভেঙ্গে পড়েছিল বলে', শত্রুর শেষ রাখ্তে নাই এই নীতি অনুসারে স্পেনেও রাজ্যবিস্তার। এম্নি করে' দক্ষিণ আর পশ্চিমের ভাবনা যখন ঘুচ্‌ল তখন স্বভাবতই দৃষ্টি গেল পূবের দিকে। গায়ে জোর থাক্‌লে এ 'আশঙ্কার' ত আর শেষ নাই! পূবে তখন ছিল আলেক্‌জেণ্ডারের ভাঙ্গা সাম্রাজ্যের গোটা কয়েক বিচ্ছিন্ন টুক্‌রা। ওরি মধ্যে যে দুটি একটু প্রবল—ম্যাসিডন আর এসিয়া, তারা তখন রোমেরই মত আশপাশের রাজ্যগুলিকে গ্রাস করে' নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টায় ছিল। এ ব্যাপারকে অবশ্য উপেক্ষা কি মার্জ্জনা কিছুই করা চলে না। কেননা পরের দেশ জয় করে' রাজ্য ও বলবৃদ্ধি জিনিসটি মানুষের ইতিহাসের আদিযুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত প্রত্যেক জাতিরই নিজের পক্ষে খুব সুসঙ্গত ও অত্যাবশ্যকীয় এবং অন্য সকলের বেলাই নিতান্ত বিসদৃশ ও অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলে' মনে হ'য়েছে। সুতরাং বাধ্য হ'য়েই রোমকে এ দুটি রাজ্য আক্রমণ কর্‌তে হ'ল; এবং এদের বাহুল্য অংশগুলি ছেঁটে ফেলে যাতে এরা অতঃপর বেশি নড়াচড়া না করে' ভদ্রভাবে জীবন যাপন কর্‌তে পারে, তার ব্যবস্থা কর্‌তে হ'ল। এমন কি সঙ্গে সঙ্গে রোম একটা মহানুভবতার পরিচয় দিতেও কসুর কর্‌লে না। ইতালীতে তখন হেলেনিক সভ্যতার স্রোত বইতে আরম্ভ ক'রেছে। তারি গুরুদক্ষিণা হিসাবে গ্রীসের ছোট ছোট

নখদন্তহীন নাগরিক রাজ্যগুলিকে ম্যাসিডনের প্রভুত্ব থেকে মুক্ত করে' রোম তাদের একবারে স্বাধীনতা দিয়ে দিল। কিন্তু দুঃখের কথা মহানুভবতার এ খেলাও রোম বেশি দিন খেল্‌তে পার্‌ল না! কারণ দানে পাওয়া স্বাধীনতার মানেই হ'ল—স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োগটা কর্‌তে হবে দাতারই ইচ্ছা অনুসারে। সুতরাং গ্রীসের চপল প্রকৃতির লোকগুলি যখন নিয়মের ব্যতিক্রম করে', ম্যাসিডনের আবার মাথা তুল্‌বার চেষ্টা দেখে, তাকেই নায়ক ভেবে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকাশ কর্‌ল, তখন এই পূবের দেশগুলির আধা স্বাধীনতা আধা অধীনতার বিশ্রী অবস্থাটা ঘুচিয়ে সোজাসুজি এদের করায়ত্ত করে' নেওয়া ছাড়া রোমের আর গত্যন্তর থাক্‌ল না। এর পর রোমান চোখের দিক্‌চক্রবালে যে দুটি রাজ্য বাকী থাক্‌ল, সিরিয়া আর মিশর, তাদের নিয়ে অবশ্য বেশি বেগ পেতে হ'ল না। অবস্থা দেখে তারা আপনারাই এসে রোমের পায়ে মাথা ঠেকালে। সাম্রাজ্য যখন গড়ে' উঠ্‌ল তখন কাজে কাজেই তার "বৈজ্ঞানিক চৌহদ্দি"রও খোঁজ পড়্‌ল। কৃষ্ণসাগরতীরের মিথ্‌রেডেটিসএর রোমের শিকল ভেঙ্গে হাত পা ছড়াবার দুরাকাঙ্ক্ষা দমন উপলক্ষে, রাজ্যের পূব-সীমা ইউফ্রেটিসে গিয়ে ঠেক্‌ল, এবং স্বয়ং জুলিয়স কেল্টদের মৃতদেহের উপর দিয়ে রোম সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমা আটলাণ্টিক পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেন। সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সম্রাটেরও আবির্ভাব হ'তে খুব বেশি বিলম্ব ঘটল না। কেননা তিন শ' বছর রাজ্য—

জয়ে আর রাজ্যভোগে প্রাচীন রোমান বল-বীর্য্য-ঐক্য সকলেরই তখন লোপ হ'য়েছে। প্রকৃতির পরিশোধ! আর পররাজ্যজয়ে যে সাম্রাজ্য ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠা, যুদ্ধজয়ী সেনাপতি তার নায়কত্ব না পেলেই বরং বিস্ময়ের কারণ হ'ত। সিজারের উত্তরাধিকারীরা আরও তিন শ' বছর ধরে' এই রোম-সাম্রাজ্য, যাকে কোন রকমেই আর রোমান সাম্রাজ্য বলা চলে না, শাসন ও রক্ষা কর্‌লেন। রাজ্যের সকল জাতির লোকের মধ্যে রোম-নাগরিকের অধিকার ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল, কেননা তখন সকলেই রোম-সম্রাটের সমান প্রজা, 'ফেলো সিটিজেনের' অর্থ দাঁড়িয়েছে 'ফেলো সাব্‌জেক্ট'। উঁচু আশা ও বড় আকাঙ্ক্ষার তাড়না না থাক্‌লে যে শান্তি আপনিই আসে, রাজ্যজুড়ে সে শান্তি বিরাজ কর্‌তে লাগ্‌ল। ঘরকন্নার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপযোগী পাকা আইন-কানুন এই বহুজাতি ভূয়িষ্ঠ রাজ্যের মধ্যে গড়ে' উঠ্‌ল। তারপর মানুষের গড়া অপর সকল রাজ্যের মত রোম-সাম্রাজ্যও ভেঙ্গে পড়্‌ল। ইউরোপের সভ্যতার কেন্দ্র ভূ-মধ্যসাগর ছেড়ে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরকে আশ্রয় কর্‌ল। তারি তীরে তীরে নবীন সব জাতির মধ্যে মানুষের সভ্যতার চির-পুরাতন ও চির-নূতন খেলার আরম্ভ হ'ল।

(৩)

এই যে ছয় সাত শ' বছরের রাজ্যজয় ও রাজ্যশাসনের পলিটিক্যাল্ ইতিহাস, রোমান সভ্যতা ও গৌরবের কাহিনীরও

এই হ'ল অন্তত চোদ্দ আনা। একে বাদ দিলে রোমান সভ্যতার যা অবশিষ্ট থাকে তার গৌরবের কাছে প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার কথা দূরে থাক, তার চেয়ে অনেক ছোট সভ্যতারও মাথা নীচু করার কোনও কারণ দেখা যায় না। হেলেনিক সভ্যতার দৃষ্টান্তটি চোখের সাম্‌নে থাক্‌তে নিজেদের সভ্যতার এই স্বরূপ সম্বন্ধে রোমানদের মনেও সংশয়ের কোনও অবসর ছিল না। আগষ্টাসের সভাকবি তাঁর যুগের আত্মবিস্মৃত রোমানদের প্রকৃত রোমান-গৌরব স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বল্‌ছেন,—'জানি আর আর সব জাতি আছে যারা কঠিন ধাতুকে সুষমাময় গড়ন দিতে পারে, পাথরের হিম দেহ থেকে প্রাণের বিপুল উচ্ছ্বাস খুঁড়ে' বের কর্‌তে পারে, জ্ঞানের আঙুল আকাশে তুলে নক্ষত্রলোকেরও সকল বার্ত্তা এঁকে দেখাতে পারে, কথার সঙ্গে কথা গেঁথে লোকের করতালি নিতেও তারা পটু, কিন্তু রোমান, এ সব কাজ তোমার নয়। তোমার কাজ হ'ল—সকল জাতির উপর রাজত্ব করা। সেই হ'ল তোমার শিল্পকলা। তোমার গৌরব হ'ল বিজিত রাজ্যে শান্তি আনা, উঁচুমাথাকে যুদ্ধে নীচু করা, পতিত যে শত্রু তাকে করুণা দেখান।' 'এনিড' যে ইতিহাস নয়, কাব্য, পতিত শত্রুকে করুণা দেখানোর কথা বলে' ভার্জিল বোধ হয় তারি ইঙ্গিত করেছেন। কেননা রোমের ইতিহাসের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত এ বস্তুটি কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। যা হোক, ল্যাতিন কবির রোমান সভ্যতা ও গৌরবের এই বর্ণনাটী

আধুনিক কালের রোমানতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরাও এক রকম সকলেই মেনে নিয়েছেন। কারণ না মেনে উপায় নাই। এবং এরি মধ্যে মানুষের সভ্যতা, প্রকৃতি ও শক্তির বিরাট বিকাশ দেখে' তাঁরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছেন। মানি, বহু জাতিকে যুদ্ধে পরাজয় করতে হ'লে জাতির মধ্যে যে বীর্য্য, যে ঐক্য, যে রাজনৈতিক বুদ্ধি ও বন্ধনের প্রয়োজন, তার মূল্য কিছু কম নয়। কিন্তু এই বস্তুকে সভ্যতার একটা শ্রেষ্ঠ বিকাশ বল্‌লে মানুষের প্রকৃতিকেই অপমান করা হয়। আর জাতির এই বীর্য্য, ঐক্য ও বুদ্ধি যখন পরের দেশ জয় ও পরের উপর আধিপত্যেই নিঃশেষে ব্যয় হয়, তখন তার শক্তি দেখে অবশ্য স্তম্ভিত হ'তে হয়, যেমন কালবৈশাখীর রুদ্রমূর্ত্তিতে মানুষ স্তম্ভিত হয়। প্রকৃতপক্ষে একটা সমগ্র জাতি, নবীন শক্তি সঞ্চারের আকস্মিক উন্মাদনায় নয়, কিন্তু যেমন মম্‌সেন দেখিয়েছেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী সূক্ষ্ম লাভ লোকসানের হিসাব গণনা করে' চোখের সুমুখে যখনি যাকে প্রবল বা বর্দ্ধিষ্ণু দেখেছে তারি বুকের উপর পড়ে' তার জীবনের বল নিঃশেষে শুষে' নিয়ে নিজেকে পুষ্ট করেছে, রোমান ইতিহাসের এই ব্যাপারটি তার ভীষণতায় মানুষকে স্তম্ভিত না ক'রেই পারে না; খৃষ্টান ও পার্শি পুরাণে যে অন্ধকার ও অমঙ্গলের দেবতার কল্পনা আছে সেটা ভিত্তিহীন নয় বলেই মানুষের বিশ্বাস জন্মায়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রোমের এই প্রবল পলিটিক্যাল্ সভ্যতা, কেবল সমসাময়িকদেরই মাথা ভয়ে হেঁট করিয়ে

রাখে নি, কিন্তু উত্তরকালের ঐতিহাসিকদেরও শ্রদ্ধায় নতমুণ্ড করে' রেখেছে। প্রাণতত্ত্ববিদেরা হয় ত বল্‌বেন মানুষ পশুরই বংশধর ; শক্তির বিকাশ দেখ্‌লেই পূজা না করে' থাকৃতে পারে না। মম্‌সেন বলেছেন, এথেন্স যে রোমের মত রাষ্ট্র গড়্‌তে পারে নি, সে জন্য তার দোষ ধরা মূর্খতা। কেননা গ্রীক প্রকৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠত্ব ও যা কিছু বিশেষত্ব, তা ছিল তেমন একটা রাষ্ট্র গড়ে' তোলার প্রতিকূল। অনিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রকে বরণ না করে', গ্রীসের পক্ষে জাতীয় একতা থেকে রাষ্ট্রীয় ঐক্যে পৌছান সম্ভব ছিল না। সেই জন্য গ্রীসে জাতীয় একত্বের যখনি বিকাশ ঘটেছে সেটা কোনও রাষ্ট্রীয় ভিত্তির উপর ভর করে' নয়। অলিম্পিয়ার ক্রীড়াঙ্গন, হোমারের কবিতা, উরিপিডিসের নাটক, এই সবই ছিল হেলাসের ঐক্য-বন্ধন। ঠিক আবার তেমনি ফিডিয়াস্ কি আরিষ্টফেনিসের জন্ম দেয় নি বলে' রোমকে অবহেলা করা অন্ধতা। কেননা রোম স্বাধীনতার জন্য স্বাতন্ত্র্যকে, রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তির ইচ্ছা ও শক্তিকে নির্ম্মমভাবে দমন ক'রেছে। ফলে হয়ত ব্যক্তিগত বিকাশের পথ রুদ্ধ হ'য়েছে, প্রতিভার ফুলও মুকুলেই ঝরে' পড়েছে ; কিন্তু তার বদলে রোম পেয়েছে স্বদেশের উপর এমন মমত্ববোধ ও 'পেট্রিয়টিজ্‌ম্', গ্রীসের জীবনে যার কোনও দিন প্রবেশ ঘটে নি। এবং প্রাচীন সভ্যজাতিগুলির মধ্যে রোমই স্বাধীন রাজতন্ত্রের ভিত্তির উপর জাতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য হ'য়েছে। সেই জাতীয় ঐক্যের ফলে কেবল বিচ্ছিন্ন হেলিনিক জাতির

উপরে নয়, পৃথিবীর সমস্ত জানা অংশের উপর প্রভুত্ব, তাদের করতলগত হ'য়েছিল।

আমাদের শাস্ত্রে আছে 'পুরুষের' শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই, তাই শেষ, তাই 'পরা গতি'। পরিচিত সমস্ত পৃথিবীর উপর অবাধ প্রভুত্ব কি মানব-সভ্যতার 'পুরুষ', তার 'কাষ্ঠা' ও 'পরা গতি'! এ প্রভুত্ব ত কালে উঠে কিছুকালের পরই বিলোপ হয়; মানুষের সভ্যতার ভাণ্ডারে কিছুই স্থায়ী সম্পদ রেখে যায় না। আমার সুমুখে উরিপিডিসের কয়েকখানি নাটক রয়েছে। এ গুলি ত কেবল খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর হেলাসের ঐক্য-বন্ধন নয়। তেইশ শ' বছর আগেকার এথেন্সের নাগরিকের মত আমিও যে আজ সে কাব্যের রসে মেতে উঠ্‌ছি। এগুলি যে চিরদিনের জন্য মানব-সভ্যতার অক্ষয় মঞ্জুষায় সঞ্চিত হ'য়ে গেছে। যুগের পর যুগ বিশ্বজন এর সুধা আনন্দে পান করবে। আর রোমের প্রভুত্ব?—সেটি রয়েছে—ঐ মম্‌সেনের পৃষ্ঠায়। এই যে প্রভেদ, এ ত মম্‌সেনের চার ভল্যুমও মুছে ফেল্‌তে পারে না। একে কেবল মানুষের সভ্যতার প্রকার ভেদ বলে' আপোষ মীমাংসার চেষ্টায় কোনও ফল নাই। এর একটির চেয়ে আর একটি শ্রেষ্ঠ, নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ; যেমন জড়ের চেয়ে জীবন শ্রেষ্ঠ, প্রাণের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ।

মানুষের সভ্যতার ধারা দুই। এক ধারা ব'য়ে যাচ্ছে—কেবলই কালের মধ্য দিয়ে—জাতিকে, সভ্যতাকে ভাসিয়ে নিয়ে স্মৃতি ও বিস্মৃতির মহাসাগরে মিশিয়ে দিচ্ছে। নতুন জাতি,

নূতন সভ্যতার স্রোত এসে ধারার প্রবাহকে সচল রাখ্‌ছে। আর এক ধারা জন্ম নিয়েছে কালেরই মধ্যে, কিন্তু কালকে অতিক্রম করে' ধ্রুবলোকে অক্ষয় স্রোতে নিত্যকাল প্রবাহিত হচ্ছে। নূতন স্রোত এসে এ ধারাকে পুষ্ট কর্‌ছে; কিন্তু এতে একবার যা মিশছে, তার আর ধ্বংস নেই, তা অচ্যুত। কেননা এ লোকে ত পুরাতন কিছু নেই, সবই সনাতন, অর্থাৎ চির-নূতন। সভ্যতার সৃষ্টির এই যে নশ্বর দিকটা এ কিছু তুচ্ছ নয়। এইখানেই বিবিধ মানবের বিচিত্র লীলা, সমাজ গঠনে, রাষ্ট্র নির্ম্মাণে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে, মহত্ত্বে, হীনতায় চিরদিন তরঙ্গিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। হোক্ না এ মৃত্যুর অধীন, তবুও জীবনের রসে ভরপূর। কিন্তু মানুষ ত কেবল জীব নয়। সে যে মর অমরের সন্ধিস্থল। মৃত্যুর পথে যাত্রী হ'য়েও সে অমৃতলোকেরই অধিবাসী। তাই তার সৃষ্টির যেটা শ্রেষ্ঠ অংশ সেটা কালের অধীন নয়। তার ইতিহাস আছে কিন্তু তা ঐতিহাসিক নয়। সেখানে যে ফুল একবার ফোটে তার প্রথম দিনের গন্ধ সুষমা চিরদিন অটুট থাকে; যে ফল একবার ফলে, রসে আস্বাদে তা চিরদিন সমান মধুর।

দুই সভ্যতার যদি শ্রেষ্ঠত্বের মীমাংসা করতে হয়, তবে মানুষের সভ্যতার এই অক্ষয় ভাণ্ডারে কার কতটা দান, তাই হ'ল বিচারের প্রধান কথা। এ মাপকাটিতে মাপ্‌লে, রোমান সভ্যতা গ্রীক কি হিন্দু সভ্যতার সঙ্গে এক ধাপে দাঁড়াতে পারে না। তাকে নীচে নেমে দাঁড়াতে হয়। যতদিন তার

সাম্রাজ্য ছিল, ততদিন তার বলের কাছে—সবারই মাথা নীচু করে' থাকতে হ'য়েছে। কিন্তু উত্তর কালের লোকেরা কেন তার কাছে সম্ভ্রমে নতশির হবে? তাদের জন্য ত সে বিশেষ কিছু সঞ্চয় করে' রেখে যায় নি। তার যা প্রধান দাবী, তার পলিটিক্যাল্ শক্তি ও বুদ্ধি, তার পাওনা ত তার সমসাময়িকেরা এক রকম ষোল আনাই মিটিয়ে দিয়েছে। আমাদের কাছে সে দাবীর জোর খুব বেশি নয়। তার গৌরবের চৌদ্দ আনা হ'ল তার ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস জীবনের কাহিনী হ'লেও জীবন নয়, কেবলই কাহিনী। তার পৃষ্ঠার সঙ্গে মানুষের আত্মার কোনও সাক্ষাৎ যোগ নাই। একজন ফরাসী পণ্ডিত রোমানদের দার্শনিক আলোচনা সম্বন্ধে বলেছেন যে, সেগুলি এখন বক্তৃতা-শিক্ষার ইস্কুলের ছাত্রদের লেখা প্রবন্ধের মত মনে হ'লেও যাদের জন্য সে গুলি লেখা হয়েছিল তাদের জীবনে ওর প্রভাব ছিল খুব বেশি। সুতরাং এ সব দার্শনিকের মূল্য বুঝ্তে হ'লে সেই সময়কার রোমের ইতিহাসের সঙ্গে সে সব মিলিয়ে পড়্তে হবে। হায় রোম, তোমার দার্শনিক চিন্তারও ইতিহাসের হাত থেকে মুক্তি নাই!

(৪)

রোমের পলিটিক্যাল্ গৌরবের গুণগান মুখে যতই কেন থাকুক না, রোমান সভ্যতার এই প্রকৃতিটি পণ্ডিতদের মনে অস্বস্তির সঞ্চার না করে' যায় নি। সেই জন্য য়ুরোপের বর্ত্তমান

সভ্যতা, রোমের সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের কাছে কেমন করে' কতটা ঋণী, মম্‌সেন তার বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এবং ছোট বড় মাঝারি সকল পণ্ডিতই তার পুনরাবৃত্তি করেছেন। সে ব্যাখ্যার প্রধান কথাটা এই—রোম সাম্রাজ্যের প্রাচীর যদি বর্ত্তমান য়ুরোপীয় জাতিগুলির অসভ্যকল্প পূর্ব্বপুরুষদের ঠেকিয়ে না রাখ্‌ত, তবে তারা যখন রোম সাম্রাজ্যের উপরে পড়ে' তাকে ধ্বংস করেছিল, সে ঘটনাটি ঘটত আরও চার-শ' বছর আগে। এবং তা হ'লে বিস্তীর্ণ রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে,—স্পেনে, গলে, ড্যানিউবের তীরে তীরে, আফ্রিকায়, হেলেনিক সভ্যতার নব সংস্করণ মেডিটারেনিয়ন সভ্যতা যে শিকড় বসাতে সময় পেয়েছিল, তা আর ঘটে' উঠ্‌ত না। আর তার ফল হ'ত এই যে, ঐ অর্দ্ধ-সভ্য জাতিগুলি ঐ সভ্যতার সংস্পর্শে এসে যে আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা গড়ে' তুলেছে, তা কখনই গড়্‌তে পার্‌ত না।

মানুষের ইতিহাসে যে ঘটনাটা এক রকমে ঘটে গেছে, সেটা সে রকম না ঘটে' অন্য রকম ঘট্‌লে তার ফলাফল কি হ'ত এ তর্ক নিরর্থক। তাতে 'স্বপ্নলব্ধ' ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। সুতরাং রোম সাম্রাজ্যকে তার চৌকিদারির প্রাপ্য প্রশংসাটা নির্ব্বিবাদেই দেওয়া যাক্। কিন্তু এ ত' রোমান সভ্যতার কোনও গৌরবের কাহিনী নয়! এবং রোম সাম্রাজ্যকে যাঁরা চার-শ' বছর ধরে' রক্ষা করেছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার মুখ চেয়ে তা করেন নি! আর এটাও যদি গৌরবের কথা হয় তবে রোমকে আরও একটা

গৌরবের জন্য পূজা দিতে হয়। সে হচ্ছে ঠিক সময়ে সাম্রাজ্যের প্রাচীরকে রক্ষা করতে না পারা। কেন না রোম যদি আরও চার-শ' বছর সাম্রাজ্যকে অটুটই রাখতে পারত, তবে ত আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা আরও চার-শ' বছর পিছিয়ে যেত এবং হয় ত সে সভ্যতা আর তখন গড়েই উঠতে পারত না! ইতিহাসে তার ওজন কত, সেটা সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের মাপ নয়।

এই যে চার-শ' বছর ধরে' পৃথিবীর একটা বৃহৎ অংশে বিচিত্র সব জাতি পরস্পরের সংস্পর্শে এল তার ফলে সৃষ্টি হ'ল কি? মেডিটারেনিয়ন সভ্যতার এই প্রকাণ্ড শূন্যতা, সমস্ত পলিটিক্যাল্ সভ্যতা,—রাজ্য-জয় ও রাজ্য-শাসনের সভ্যতার উপর একটা বিস্তৃত ভাষ্য। বিস্তীর্ণ বাগানের চার পাশে পাথর দিয়ে বেড় দেওয়া হ'ল পাছে আকস্মিক বিপৎপাতে বাগান নষ্ট হয়। পাথরের দেয়াল খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌ল, কিন্তু বাগানে ফুলও ফুট্‌ল না, ফলও পাক্‌ল না।

(৫)

রোমান সভ্যতার এই যে উচ্চ জয়গান, এ যে কেবল মিথ্যা স্তুতি তা নয়, এর কলরোল পৃথিবীর প্রবল জাতিগুলির মন চিরদিন বিপথের দিকেই টান্‌বে। যেই যখন শক্তিশালী হ'য়ে উঠবে তারই মনে হবে মানুষের বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করে' পৃথিবীর যতটা অংশের উপর পারা যায়, নিজের আধিপত্যের একরঙা তুলিটা বুলিয়ে নেওয়া কেবল স্বার্থ সিদ্ধির উপায় নয়, সভ্যতায়

শ্রেষ্ঠত্ব লাভেরই পথ। এ যে অতিশয়োক্তি নয়, তার প্রমাণ মম্‌সেন থেকেই তুলে দিচ্ছি। সিজারের গল বিজয়ের বর্ণনা মম্‌সেন এই বলে' আরম্ভ করেছেন—'যেমন মাধ্যাকর্ষণ ও আর আর পাঁচটা প্রাকৃতিক নিয়ম যার অন্যথা হবার যো নেই তেমনি এ'ও একটা প্রাকৃতিক নিয়ম যে, যে জাতি রাষ্ট্র হ'য়ে গড়ে' উঠেছে সে তার অ-রাষ্ট্রবদ্ধ প্রতিবেশী জাতিগুলিকে গ্রাস করবে, এবং সভ্যজাতি, বুদ্ধিবৃত্তিতে হীন তার প্রতিবেশিদের উচ্ছেদ করবে। এই নিয়মের বলে ইতালীয় জাতি (প্রাচীন জগতের একমাত্র জাতি যে শ্রেষ্ঠ পলিটিক্যাল্ উন্নতির সঙ্গে শ্রেষ্ঠ সভ্যতা মেশাতে পেরেছিল, যদিও শেষ বস্তুটির বিকাশ তাতে অপূর্ণ ভাবে এবং কতকটা বহিরাবরণের মতই ছিল) পূবের গ্রীকদের, যাদের ধ্বংসের সময় পূর্ণ হ'য়ে এসেছিল, তাদের করায়ত্ত করতে, এবং পশ্চিমের কেণ্ট জার্ম্মাণদের, যারা সভ্যতার সিঁড়ির নীচের ধাপে ছিল, তাদের উচ্ছেদ সাধন করতে সম্পূর্ণ অধিকারী ছিল।'

প্রাকৃতিক নিয়ম যে কেমন করে' অধিকারে পরিণত হয় সে রহস্যের চাবী হয়ত হেগেলের 'লজিকে'ও মিলবে না। সে যাই হোক্ এ 'নিয়ম' ও 'অধিকারের' মুস্কিল এই যে এর জন্য পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে সারাক্ষণ নখদন্ত বের করেই থাকতে হয়। কেননা মল্লাঙ্গনই হচ্ছে এ 'অধিকার' প্রমাণের একমাত্র স্থান। কারণ বুকের উপর চেপে বসতে পারলেই প্রমাণ হ'ল যে চেপে বসার অধিকার আছে; আর তাই হ'ল এ অধিকার প্রমাণের

একমাত্র শাস্ত্রীয় প্রথা। তারপর শক্তি থাক্‌লেই যখন 'অধিকার' আছে, তখন শক্তির পরীক্ষার অধিকার থেকেও কাউকে বঞ্চিত করা চলে না। পরীক্ষা না কর্‌লে ত শক্তিটা ঠিক আছে কিনা তা আগে থেকে অমনি জানবার উপায় নেই। শেষ পর্য্যন্ত ফেল হ'লেও "হলে" ঢোকার অধিকার অস্বীকার করা যায় কেমন করে'? গেল চার বছর ধরে' এই পরীক্ষাটা সারা য়ুরোপ জোড়া চল্‌ছে। মম্‌সেনের সৌভাগ্য যে বেঁচে থেকে তাঁর প্রণালীর ফলটা দেখে যেতে হয় নি। কিন্তু প্রাচীন রোমের গুণগানে যাঁরা মুখর, আধুনিক জার্ম্মাণির উপর মুখ বাঁকানোর তাঁদের কোনও অধিকার নেই। কার্থেজ ও মিশর বিজয় যদি রোমের পক্ষে ছিল গৌরবের, তবে বেলজিয়মকে গ্রাস করা জার্ম্মাণির পক্ষে অগৌরবের কিসে? আজকার পলিটিক্সে যা হীন, কালকার ইতিহাসে তা মহৎ হয় কোন্ ন্যায়ের জোরে?

এই যে পলিটিক্যাল্ শক্তি ও সভ্যতার স্তুতিগান—এ মূলে হ'ল একটা 'মায়া'। শঙ্কর ব্যাখ্যা করেছেন মায়ার প্রকৃতি 'অধ্যাস,'—একের ধর্ম্ম অন্যে আরোপ করা। পৃথিবীর আদিযুগ থেকে যখন জাতিতে জাতিতে লড়াই চলে' আস্‌ছে আর কোন 'লীগ অব নেশনে'-ই তা শেষ হবে বলে' যখন বোধ হয় না, (কেননা 'লীগের' একটা অর্থ হচ্ছে এর ভিতরে যারা আস্‌বে না তারা শত্রু, আর বাইরে যাদের রাখা হবে তাদের এজমালীতে দমন করা চল্‌বে) তখন জাতির রাষ্ট্রীয় শক্তি তার

আত্মরক্ষার পক্ষে অমূল্য। জাতির প্রাণই যদি না বাঁচে তবে তার মনের বিকাশও কাজে কাজেই বন্ধ হয়। কিন্তু এই শক্তি যখন আত্মরক্ষায় নয়—পর-পীড়নেই রত থাকে, রক্ষার চেষ্টায় নয়—ধ্বংসের লীলাতেই মেতে ওঠে তখনও যে তার পূজা, তার মূলে হ'ল 'অধ্যাস'। একের গুণ আর একজনে দেখা, রামের পাওনা শ্যামকে বুঝিয়ে দেওয়া। অবিশ্যি এ দুয়ের সম্বন্ধ অতি নিকট। কিন্তু একান্ত 'অবিষয়' হ'লে ত 'অধ্যাসেরও' উৎপত্তি হয় না।

আশ্বিন, ১৩২৫

আর্য্যামি

(১)

আমাদের আদিম আর্য্য প্রপিতামহেরা ধরাপৃষ্ঠের ঠিক কোন্ জায়গা থেকে যাত্রারম্ভ করে' যে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছেন, সে প্রশ্নের একটা নিশ্চিত জবাব দেওয়া শক্ত। তাঁরা কি মধ্য-এশিয়ার পশ্চিম দিকটায় ভেড়া চরাতেন, না নরওয়ের উত্তর-মাথায় মাছ শীকার করতেন, এ তর্কের এখনও মীমাংসা হয় নি। ভাষাতত্ত্বের প্রমাণে যে যব তাঁরা সকলে মিলে নিঃসন্দেহই খেতেন, তা তাঁদের চাষ করে'-পাওয়া, না ইউফ্রেটিসের তীরের বুনো যব, সে বিষয়েও মহা মতভেদ রয়েছে। তার পর তাঁদের সবারই মাথার প্রস্থের একশ গুণকে দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ কর্‌লে ভাগফল যে কখনই পঁচাত্তরেব বেশী হ'ত না, এ কথা আর এখন কোনও পণ্ডিতই হলপ নিয়ে বলতে রাজী নন। বরং শোনা যাচ্ছে যে, যেমন আমাদের বাঙালী ব্রাহ্মণেরা সবাই এক আর্য্যবংশাবতংস হ'লেও তাঁদের চেহারায় এ মিলটা ধরার জো নেই, কেননা কেউ কটা কেউ কৃষ্ণ, কারও মাথা গোল কারও চেপ্টা, তেমনি আদিম আর্য্যদের মধ্যেও চেহারার এই গরমিলের দিকেই প্রমাণের পাল্লাটা নাকি বেশী ভারী হ'য়ে

দাঁড়াচ্ছে। এমন কি একদল কালাপাহাড়ি পণ্ডিত এরই মধ্যে বল্‌তে সুরু করেছেন যে, আর্য্য বলে' কোনও একটা বিশিষ্ট জাত, অর্থাৎ একটা বিশিষ্ট জাত যাকে ঐ এক নামে ডাকার কোনও বস্তুগত কারণ আছে, কোনও দিনই কোনও-খানে ছিল না। ওটা একটা ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের পণ্ডিতদের মানসিক সৃষ্টি, 'ওয়ার্কিং হাইপথিসিস্'।

যেমন গতিক দেখা যাচ্ছে, তাতে করে' প্রাচীন ও আদিম আর্য্যজাতির অদৃষ্টে কি আছে বলা কঠিন। আসছে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তাঁরা বিধাতার সৃষ্টি বলে' কায়েম হ'য়েও বস্‌তে পারেন, আবার মানুষের কল্পনা বলে' বাস্তব পদার্থের লিষ্টি থেকে তাঁদের নামও কাটা যেতে পারে। কিন্তু একটা বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। আর্য্যজাতির কপালে যা-ই ঘটুক, তাঁরা বস্তু হ'য়ে চেপেই বসুন, আর অবস্তু হ'য়ে উড়েই যান, 'আর্য্যামি' বস্তুটির তাতে বিশেষ কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। যারা মনে করে, কারণ না থাকলেই আর তার কার্য্য থাকে না, তারা না পড়েছে দর্শনশাস্ত্র, না আছে তাদের লৌকিক জ্ঞান। 'নিমিত্ত' কারণ যে একটা কারণ, একথা আরিষ্টটল্ থেকে অন্নভট্ট পর্য্যন্ত সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন। এবং ও-কারণটি নিজে ধ্বংস হ'লেও তার কার্য্য ধ্বংস হয় না। যেমন নিজের বোনা কাপড়খানির পূর্ব্বেই তাঁতি বেচারীর জীবনান্ত ঘটতে কিছুই আটক নেই। আর পুঁথি ছেড়ে সংসারের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেও এর ভূরি ভূরি প্রমাণ চোখে

পড়্বে। যুদ্ধ থেমে গেছে কিন্তু 'পাব্লিসিটি বোর্ড' চল্ছে; জর্ম্মাণভীতি ঘুচে গেল অথচ 'রিফর্ম্ম স্কীম' নিয়ে আমাদের তর্ক শেষ হয় নি; এমন কি বিলাতের কলের মজুরেরা যেমন যুদ্ধের মধ্যে দুবেলা পেটপুরে খেয়েছে, যুদ্ধের পরেও তেমনি চলুক বলে' হাঙ্গাম উপস্থিত করেছে।

কিন্তু প্রকৃত গোড়ার কথা এই যে, 'আর্য্যামির' সঙ্গে 'আর্য্যের' আসলে কোনও কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নেই। আর্য্যজাতি পৃথিবীতে যতই প্রাচীন হ'ন না কেন, 'আর্য্যামি' জিনিষটি যে মনুষ্য-সমাজে তার চেয়ে ঢের বেশি প্রাচীন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করা চলে না। ব্যুৎপত্তি দিয়ে বস্তুনির্ণয়ের চেষ্টা করে শুধু এক বৈয়াকরণ; এবং ও-জাতটি যে কাণ্ডজ্ঞানহীন একথা সর্ব্ববাদীসম্মত। 'আর্য্যামি' হ'ল মানুষের সেই মনোবৃত্তির প্রকাশ ও বিকাশ, বিলাতী পণ্ডিতদের মতে যাতে ইতর প্রাণী থেকে মানুষ তফাত, অর্থাৎ তার 'সেল্ফ্ কন্‌শাস্‌নেস্'; আর দেশীতত্ত্বজ্ঞদের মতে যার সম্পূর্ণ বিনাশ, অথবা যা একই কথা— চরম বিকাশই হচ্ছে পরামুক্তির পথ, অর্থাৎ অহংজ্ঞান। সমাজতত্ত্ববেত্তারা বলেন, মানুষ যে পরের মধ্যে নিজের সাদৃশ্য দেখে, তাতেই সে অপরের সঙ্গে সমাজ বেঁধে ঘর কর্‌তে পারে। এই সাদৃশ্যবোধ হ'ল সমাজবন্ধনের একটা পোক্ত শিকল। কিন্তু সবাই জানে ভিন্ন জিনিষের মধ্যে সাদৃশ্যজ্ঞানটা সাধারণ বুদ্ধির কথা। সূক্ষ্মবুদ্ধির কাজ হচ্ছে একই রকম জিনিষের মধ্য থেকে তফাত বের করা। সুতরাং মানুষ যখন সূক্ষ্মবুদ্ধির